স্মৃতির আলো

শ্রীপ্রতিমা ঘোষ

প্রকাশক
শ্রীপ্রতিমা ঘোষ
বার্ণপুর

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ ১৩৪৫
মূল্য---১।০ সিকা

প্রাপ্তি স্থান

দত্ত ব্রাদার্স
নাহাপরিবার
জলপাইগুড়ি

প্রিন্টার
বি, এন, ঘোষ
আইডিয়াল প্রেস
১২।১ হেমেন্দ্র সে

স্মৃতির আলো

গ্রামের শেষ প্রান্তে তৃণে ছাওয়া ছোট কুটীর, বলাই আর তার
ব[illegible] থাকে, দিন যায় সকলের যেমন, তাদেরও তেমনি। তবে কখনো,
অনাহারে কখনও অর্দ্ধাহারে। বলাই চাষা, সামনের সরু রাস্তা ধরিয়া
ক[illegible] লোক যায় আসে। কারো মুখে প্রসন্ন হাসি, কারো মুখে কাঁদন
[illegible] কাতর দৃষ্টি কাজলী খোলা দাওয়ায় বসিয়া তাই দেখে, দেখিতে
[illegible]ত হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সেদিন শুক্লা দ্বিতীয়া...। সন্ধ্যা
বেলাই কাজলী ঘরের মেঝেয় আঁচল বিছাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।
জীর্ণ কুটীরের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো অনশন ক্লিষ্টা কাজলীর মুখের
উপর পড়িতেই হঠাৎ তার ঘুম ভাঙিয়া গেল। বাহিরে শিশুর ক্রন্দন
ধ্বনি শুনিয়া কাজলী চকিতে ছুটিয়া চলিল। সামনেই সেই শিশু।
[illegible] উপরে পূর্ণিমার চাঁদ অপরূপ দীপ্তি ছড়াইয়া হাসিতেছিল, যেন
[illegible] একটুকরা শিশুমূর্ত্তিতে কাজলীর পায়ের কাছে আসিয়া
[illegible]য়াছে। গোল গাল্ নধর গড়ন। অকস্মাৎ কাজলী তাকে বুকে
[illegible]রিয়া আবেগ মধুর কণ্ঠে বলিল "ওরে। আমার স্নেহ হারাণ
[illegible] এতদিন কোথায় ছিলি বাপ্।" শিশুর অস্ফুট ক্রন্দন হঠাৎ

কাজলীর মায়াস্পর্শে মিলাইয়া গেল। সে একদৃষ্টে কাজলীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল, যেন কত কালের কত যুগের চেনা। কাজলী তার গোলাপ গণ্ডে মাতৃস্নেহের পূতচিহ্ন আঁকিয়া দিল।

অনেক দিনের সঞ্চিত ব্যথার পরে কত বড় তৃপ্তি। আঃ॥—

বলাই হাট হইতে ঘরে ফিরিতেছিল, অনেক দিনের পুরাতন সুখের স্মৃতি আজিকার ভরা জ্যোৎস্নায় তার বক্ষের পরদায় মৃদু কম্পন তুলিতেছিল। গুন্ গুন্ করিয়া সে গাহিতেছিল—

"মন মাঝিরে
আরতো তরী বাইতে নারি
ঝিঙ্গার ফুল ফুইটা উঠছো—
ঘিরছে আকাশ সাঁঝের আঁধারে"

হঠাৎ থমকাইয়া দাঁড়াইয়া বলিল "একেরে কাজলী?"……… .. গান থামিয়া গেল। বলাই বিস্ময়ে কাজলীর পানে চাহিয়া রহিল। কাজলী মাথা তুলিয়া স্বামীর দিকে চাহিল, সে মুখে বাৎসল্য প্রেমের স্বর্গীয় দীপ্তি। "ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের হাট কে বসাইছেরে কাজলী? কার মাথায় বাড়ি দিয়া"………"বাড়ী নয়গো, বাড়ী নয় আমাগো সেই হারাইনা নিধি" "হারাইনা নিধি এঁ্যা কি কইছিসরে কাজলী? তাইতো! তাইতো— ওরে আমি কি কমুরে এই দেখি সেই মুখ সেই চোখ সেই গড়ন তুই এত কান্দন কাঁনছস্ তাই বুঝি ভগবান মুখ তুইলা চাইছোন।"

* * * * *

এক কালের কথা। বলাই তখন; রাজা জমিদারের মতন একজন। জমজমে বাড়ী, খেত খামার ও মস্ত গোয়ালের অধিকারী।

কাজলের পায়ে বেঁকী খাড়ু। হাতে সোনার পৈছা বাজু কোমরে সোনার বিছা—। তার অলঙ্কারের চাকচিক্যে প্রতিবেশিনীদের ঈর্ষার উদ্রেক হইত।

বলাইরা দুই ভাই, নিজেও অপুত্রক। বাবুরা লেখা পড়া করে, বলাই এরও নিতান্ত ইচ্ছা ছোট ভাই নিতাইকে লেখা পড়া শেখায়। তার সে আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করিয়া যেদিন নিতাই সত্য সত্যই বি, এ পাশ করিয়া বলাইকে প্রণাম করিল সেদিন তার চোখ দিয়া কি আনন্দাশ্রুটাই না বহিয়াছিল? লেখাপড়া শিখিয়া বাবু হইয়া বড় ভাইকে চাষা বলিয়া বন্ধু বান্ধবের নিকট পরিচয় দিতে নিতাই যতটা কুণ্ঠিত না হইল তার বেশী হইল তার ভাবী-পত্নী, বন্ধু-ভগ্নি অনিতা। নিতাই-এর ব্রাহ্ম হইয়া অনিতার পানি গ্রহণ করা বলাইকে অঘাত দিলেও সে মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিল না। কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষা নিতাই সস্ত্রীক তাহাদেরই সংসারে আসিয়া বাস করুক। কিন্তু চাষা ভূষাকে ভাসুর বা ভাই বলিয়া পরিচয় দিতে তাহারা নারাজ, তাই বিদেশে নিত্যানন্দ বাবু নামে নিতাই সস্ত্রীক বাস করিতে লাগিল।

বলাই লোকটী নিতান্তই ভাল। নিজের রোজগারের সম্পত্তির অর্দ্ধেক ভাইকে দিয়া একবারে উদাসীন হইয়া পড়িল। এ আঘাত তার বড় বেশী বাজিয়াছিল।

এই সময়ে গ্রামের বৃদ্ধ জমীদারের মৃত্যু হইল। তার উদ্ধত পুত্র তরুণ জমীদার প্রজার উপরে নানা প্রকার অত্যাচার করিতে লাগিল। প্রথমেই তার কোপদৃষ্টি হতভাগ্য বলাইএর উপর পতিত হইল। তার ঐশ্বর্য্য পাঁচজনের অন্তরে ঈর্ষার উদ্রেক জন্মাইয়াছিল। আজ তাহারা

সুযোগ বুঝিয়া জমীদারের কাণে তাহার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনয়ন করিল।

এই সময়ে একটী নবীন শিশু তাহাদের সংসারে অতিথি হইল। বলাই দুঃখ ব্যথা ভুলিল। কাজলী তার বুভুক্ষু প্রাণের সকল স্নেহ দিয়া তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিল। জমীদারের কোপদৃষ্টিতে পড়িলে যা হয় বলাইর ও তা হইল। সে আজ রিক্ত, তবুও শান্তি পাইত, ছেলেটী যদি পরপারের উদ্দেশে যাত্রা না করিত।

নিস্তব্ধ নিশুতি রাত।

"কাজল। কাজল। কত ঘুমাইস্; ঐ শোন্ কার ছেইলা?"

কাজলী চমকিয়া জাগিয়া উঠিল; তখনো তার স্নেহ তপ্ত বুকে ছেলেটী গভীর নিদ্রায় অভিভূত।

নিদ্রালস চোখ ঘুমে জড়াইয়া আসিতে চায়।

নৈশ আকাশ বাতাস প্লাবিত করিয়া উচ্চ কর্কশ কণ্ঠ কাজলীর কানে প্রবেশ করিল। "রাজার ছেলে!—রাজার ছেলে! যে খুঁজে দেবে তাকে পাঁচশো টাকা পুরস্কার!"

বাদ্যকর একেবারে কাজলীর কুটীরের দ্বারে আসিয়া পড়িল। জোড়ে ঢ্যারা পিটাইয়া অধিক উচ্চ কণ্ঠে বলিল—"যে খুঁজে দেবে তাকে পাঁচশো টাকা পুরস্কার।"

কাজলী অস্ফুট স্বরে কাঁদিয়া উঠিল। "ওগো। টাকা চাইনা আমি। আমার হারাইনা ধন আমি দিমু না গো।"

বাৎসল্য স্নেহে একবার শিশুর দিকে চাহিয়া বলাই বলিল "আমাগো নাবে কাজল দিয়াদে দিয়াদে!"

ঘুমন্ত শিশু জাগিয়া উঠিল "মা।" "এই যে রে মাণিক আমি।—আমার ধন আমি কেমনে দিমুগো!"

বলাই এতক্ষণে প্রাণ পণে যুঝিতেছিল, কাজলীর কান্নায় রুদ্ধ অশ্রু তারও চোখের কোনে মুক্তা ধারায় দেখা দিল। জমীদারের পাইক একেবারে সম্মুখে। ভীতি ব্যাকুল কণ্ঠে বলাই বলিল "ও কাজলী!—কাজলী! তোর পায়ে পড়ি ফিরাইয়া দে!" "না—না—না, আমি দিমুনা।" তার আর্ত্ত চীৎকারে পাইকের কঠিন প্রাণ গলিল না, অভাগীর বুকের মধ্য হইতে শিশুকে ছিনাইয়া লইয়া গেল।

"মা!—মা!" বহু দূর হইতে ক্রন্দন রত শিশুর মা! মা বুলি দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

কাজলী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

মূর্চ্ছা ভঙ্গে কাজলী চোখ মেলিয়া চাহিল। উষার আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। বলাই মাথায় হাত দিয়া তার চরম শাস্তির অপেক্ষায় বসিয়াছিল।

"বলাই"।

বলাই চমকিয়া চাহিয়া দেখিল তরুণ জমীদার। ক্রোড়ে সেই শিশু! "ভয় পেওনা বলাই? খোকা সত্যই হারিয়ে গিয়েছিল। আমরা ...নিধি পেয়েছি তোমার পুরস্কার নেবে এস"।

বলাই ধীর নম্রস্বরে কহিল "তোমার ধন তুমি পাইছো, জোড় ...রা তা রাখুম ক্যান হুজুর? ঐ রূপ ধন আম... ও ছিল,

জন্মের মতন হারাইয়া ফেলাইছি, আমার অন্য ধনে প্রয়োজন নাই"।

জমীদার শিহরিয়া উঠিলেন। "কিন্তু একে তাড়িয়ে সেও যে উন্মাদিনী হয়েছিল বলাই, তাই না তোমার সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে চাই"। "আমি সম্পত্তি চাই না গো, ঐ খোকাটীকে চাই! ওরে আমার গো! আমার আমার লালু!—লালু!"—অপরাধীর ন্যায় মৃদু কণ্ঠে জমীদার কহিলেন "কিন্তু আর এক জনের কাছেও যে আমায় এমনি অপরাধী…… …" কাজলের বুকটা ছ্যাৎ করিয়া উঠিল সত্যিই তো সেও যে গর্ভধারিণী, পরের ব্যথাও যে বুঝিতে হয়। সে যে জন্মের মতন হারাইয়া ফেলিয়াছে এই জন্য দাসী কে শিশুকে জমীদারের কোলে দিয়া কাজলী সেদিনেরই মত আর্ত্ত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল "লাল!—লাল! মাণিক আমার কোথায় গেলিরে" বাহিরে শিশুর কোমল কণ্ঠের আধ ক্রন্দন তার কানে প্রবেশ করিল কি না? কে জানে?

শুভদৃষ্টি

শ্রাবণ মাস

দুপুরে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, পথ ঘাট পিচ্ছিল ও কর্দ্দমাক্ত। স্কুল হইতে ফিরিতে আজ রাণীর একটু দেরী হইয়া গিয়াছে। সঙ্গিনীরা দৃষ্টি পথ অতিক্রম করিয়া যাওয়াতে রাণী দ্রুত পদে ছুটিতে গিয়া সহসা আছাড় খাইয়া পড়িল। লজ্জিত কুণ্ঠিত মনে এদিক ওদিক চাহিয়া ত্রস্তে উঠিতেই পশ্চাতে কাহার হাসির ধ্বনি শোনা গেল। রাণী মুখ ফিরাইয়া দেখিল তরুণ বয়স্ক অপরিচিত একব্যক্তি তাহার অবস্থা দর্শনে কিছু মাত্র সহানুভূতি না দেখাইয়া কেবলই হাসিতেছে।

আঘাতের চেয়ে অপমানের তীব্র খোঁচাটাই তার কোমল বুকে অধিক তর বেদনা জাগাইল। মুহুর্ত্তে নিজের অবস্থা সামলাইয়া লইয়া পরুষ কণ্ঠে কহিল "বা! বেশ লোক তো আপনি। আমি পড়ে গিয়ে ব্যথা পেলুম; আর আপনি হাসছেন, মজা দেখাই বুঝি আপনার ধর্ম্ম?" সেই রূপ হাসিতে হাসিতে সহজ কণ্ঠেই তরুণ উত্তর দিল

"ধর্ম্ম না হয় পাপই হোল কিন্তু তোমার এই চমৎকার বেশ দেখে, এমন কে ধার্ম্মিক আছে যে না হেসে থাকতে পারে ?"

এই ঘটনার দিন চারেক পরে রাণী ছাদের উপরে তার ভাই বোনদের লইয়া খেলিতে ছিল; দুরন্ত ছোট ভাইটী অকস্মাৎ তার হাত টানিয়া অদূরে রাস্তার এক ব্যক্তিকে দেখাইয়া বলিল "ছোড় দি। ঐ দেখ নীলু বাবু যাচ্ছে। রাণী দেখিল আর কেহই নয় সেই দিনকার রাস্তার সেই বিদ্রুপকারী! "যাঃ! জ্বালাতন করিসনে"। রাস্তায় গমনোন্মুখ নীলুবাবুর কর্ণে তার নিজের নামটী উচ্চারিত হইবা-মাত্র কৌতুক ভরা দৃষ্টিতে ছাদের দিকে চাহিতেই রাণীর চোখে দৃষ্টি সম্মিলিত হইল। রাণী লজ্জায় যেন মাটীতে মিশিয়া পড়িতে চাহিল "ছি! তাহাকেই যে সেদিন বাক্য বাণে বিদ্ধ করিয়াছিল। সে ছুটিয়া নীচে নামিয়া গেল।

২

আর একদিন স্কুলে যাইবার পথে রাণীর সহিত নীলুর দেখা হইল। এই অপ্রত্যাশিত ঘন ঘন সাক্ষাতে বাহিরে সে যেমন লজ্জিত হইত। অন্তরে তেমনই ক্রুদ্ধা হইয়া উঠিত রাণী আত্ম প্রচ্ছন্ন ভাবে যতই দূরে সরিয়া পড়িতে লাগিল; সে তাহার অনুগমন করিয়া ততই তাহাকে আবিষ্কার করিতে লাগিল। বাহিরের লজ্জার দরুণ, অন্তরের অগ্নিবর্ষী ক্রোধটাকে ফুটাইয়া তুলিয়া দুইটী কথা শুনাইবার শক্তি

আজ আর রাণীব ছিল না। নীরবে সেদিনের সে ব্যবহার সহ্য করিয়াই গেল। কিন্তু পদে পদে সহিবার ক্ষমতা রাণীর মত মেয়ের পক্ষে অসম্ভব। তাই সে ইহার চরম প্রতীকারের মানসে নিজের মনকে দঢ করিয়া লইল। সে ধীরে ধীরে হাঁটিয়া অপব মেয়েদের নিকট হইতে পিছাইয়া পড়িল। নীলু এই অবকাশেরই প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহাকে অগ্রবর্ত্তী দেখিয়া রাণী তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল।

"আচ্ছা বেহায়া তো আপনি।"

"বেহায়া কি শুধু তোমারি কাছে! না ওরা ও কিছু বলে?" কারণে অকারণে হাসি রাণীর ক্রোধ বাড়াইয়া তুলিল। সে ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "বেহায়া যে সে সবারই কাছে।"

"কিন্তু কই ওরা তো তা বলে না?" "ওদের তো আর জ্বালাতন করছেন না?" "ওরা তো বকে না"।

"আমি অমনিই বকে ছিলাম কিনা? নিজের গুণের কথা মনে নেই বুঝি?" "থাকবে না কেন, ওদের তো সেই রকম চেহারা হয়নি!" "যা—ন। আপনার জ্বালাতনে দেখ্‌ছি আমাকে স্কুলই ছেড়ে দিতে হবে।"

"তাতে আমার কি বরং তোমারই ক্ষতি......"

"হোক্ গে রোজ রোজ মেয়েদের ক্ষ্যাপানোর হাত থেকে......" কথাটা শেষ হইতে পারিল না। উৎসুক নীলু তার গমন পথে দাঁড়াইয়া বলিল; "মেয়েরা তোমাকে কি বলে ক্ষ্যাপায় যদি বল তো আর তোমাকে জ্বালাতন করবো না"।

"উঁহু তা আমি মরে গেলেও বলতে পারবো না"। "না বল্লে তো বয়েই গেল, আমি বলবো? তোমার সঙ্গে আমার........" দিশাহারা

২

চঞ্চলা বালিকা উন্মত্ত প্রচেষ্টায় নীলুর মুখ চাপিয়া ধরিয়া কথাটা শেষ করিতে দিল না।

"বল্লেই হোল কিনা? তোমার মত ছোট লোকের কাছে আমার বিয়ে হবেও না"।

"তা কি হয়? তোমাকে আমার চাই—ই, নইলে এত গালা গাল কে দেবে"

"ঠাট্টা কর্লে কি হবে! অত টাকা বাবা দিতেও পারবেন না, ...হবেও না"।

"আর আমি যদি টাকা না নিই?"

"তবুও হবেনা, বাবাকে বলবো বিশেষ করে ম্যাট্রিক পাশ না করে আমি বিয়ে করবো না। সারদা বিল হয়েছে জানো' বিয়ে দিলেই হোল—এঃ"।

"বেশ ততদিনই আমি অপেক্ষা করবো"।

"তা বই কি তোমার মত বেহায়া ছোট লোককে বিয়ে করার চেয়ে পথের ভিখিরীকে বিয়ে করাও ঢের ভালো"।

"না—না রাণী লক্ষীটী। তুমি অমত কোরোনা। তোমার গাল যে আমার ভারী মিষ্টি লাগে"।

"যা—ন! এখুনি এত জ্বালাতন করছেন, বিয়ে হলে তো আরো কত করবেন"।

"একটু আধটুকু জ্বালাতন না করলে গালাগাল জুটবে কেন? তা যাক্ ছোট লোককে আবার আপনি কেন?" রাগের মাথায় রাণী অতটা বলিয়া ফেলিয়া শেষটায় লজ্জা পাইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

৩

রাণী যথার্থই বলিয়াছিল, নীলু বোসের সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধে পিতার মত হইলেও বেশী টাকা দেওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

উপর্য্যুপরি চারিটী কন্যার বিবাহ দিয়াছেন এইটী পঞ্চমা সুতরাং খুব বেশী টাকা ব্যয় করা তাহার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব।

নীলুর পিতা স্বয়ং পাত্রী দেখিয়া পছন্দ করিয়াছেন, টাকার বনিবনা হয় নাই নচেৎ বৈশাখের মাঝা মাঝি এতদিন বিবাহ হইয়া যাইত। নীল দেখিতে যেরূপ সুশ্রী গুণেও তদ্রূপ। এম, এ তে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হইয়াছে শীঘ্রই বিলাত যাইবে। সেই কারণ পিতারও শীঘ্র বিবাহ দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

এমন পাত্রটী হাতছাড়া হইবে? ধার করিয়া বিবাহ দিবেন কি না? এই আকাঙ্ক্ষা ও দ্বিধা দ্বন্দের মাঝখানে অকস্মাৎ তাহাকে আশ্চর্য্য করিয়া দিয়া রাণী বলিল "বাবা! ম্যাট্রিক পাশ না করা পর্য্যন্ত আমার বিয়ে দিও না"। পিতা বলিলেন "এখানে বিয়ে হ'লে তোর পড়ার সুবিধাই হবে, তা এখন অমত কিসের"?

রাণী তার মন্তব্য জানাইল যে শুধু পড়ার জন্য নয় যারা টাকা নিয়ে মেয়ের বাপকে সর্ব্বস্বান্ত করতে কুণ্ঠিত নয় তাদের ঘরে দাসীবৃত্তি কর্ত্তে যেতে তার এতটুকু প্রবৃত্তি নেই।

পিতা প্রশান্ত স্বরে কহিলেন "দাসী কেন হবে মা? একছেলের বৌ"।

মাথা নাড়িয়া রাণী সগর্ব্বে বলিল "রাজার হালে থাকলেও নয়, যাদের ঐরকম প্রবৃত্তি তাদের মন কোন দিনই ভাল হবে না"।

"কেন তারা লোক খুব ভাল"।

"হু ভাল বলেই তো ছেলে বিক্রী করছে"?

"যা চিরকাল লোকে করে আস্‌ছে, সেই দাবীটা তারাই বা ছাড়বেন কেন?"

"না ছাড়ে, নাই ছাড়বে কিন্তু তোমাকে সর্ব্বস্বান্ত করে, আমি ওদের ঘরে যেতে কিছুতেই রাজী হব না। আর বাবা তুমি শুধু আমার সুখটাই দেখবে, দুঃখটা কি একবারও দেখ্‌বে না? আমি রাজার হালে থাকবো আর তোমাদের ভাঙ্গা ঘরের দিকে চেয়ে চেয়ে চোখের জল ফেলবো সে বুঝি খুব ভাল হবে—না?" বলিতে বলিতে রাণীর সজল চক্ষু হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

পিতা কন্যার অন্তরের ব্যথা অনুভব করিয়া আর কিছু বলিলেন না। শুধু কন্যার অশ্রু সজল মুখের দিকে প্রশংস মান দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

৪

ইহার পরে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, নীলুর সহিত রাণীর আর দেখা হয় নাই। প্রথমটা রাণীর খুব আনন্দ হইয়াছিল যে যেমন লোক, তাহার সহিত তেমন ব্যবহার করাই ভাল। কিন্তু এক দুই করিয়া যখন অনেক দিন কাটিয়া গেল, তখন তার মনটা কেমন একটু বিচলিত

হইয়া উঠিল। মনে একটু অনুতাপও বুঝি বা জাগিল। সত্যি সেদিন বড় বেশী রকম বেহায়া পনা করিয়া ফেলিয়াছে সে। অতটা না করিলেও হইত সে কি যথার্থই তাহার উপরে রাগ করিয়া আর আসে না? তাহা হওয়াই যে সম্ভব। সে আর এখন বালিকা নয়, তরুণী কিশোরী আজ কাল স্কুলে গাড়ীতেই যায়। একদিন একটু দেখা হইলেই ওটা কথায় ক্ষমা চাহিয়া লইলেই, অনুতাপ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইত। কিন্তু তাহা হইলে নিজেকে বড় ছোট হইতে হয়। তা হউক, সে তো ভুলেও একবার তাহাকে তিরস্কার বা গঞ্জনা দিতে আসে নাই! অকুরন্ত হাসির মধ্য দিয়াই তো তার তিরস্কারের উত্তর দিয়াছে। তবে তাহার নিকট আবার মান্ অপমান কি? এইরূপ মনের সংশয় একদিন তার ছোট ভাই আসিয়া মিটাইয়া দিল। "দিদি নীলুদা অজয়ের কাছে চিঠি লিখেছে, ঐ সঙ্গে আমাকেও লিখেছে"।

"তোর সঙ্গে আবার তার খাতির হল কবেরে?"

"বাঃ অজয় যে তার খুড়তুত ভাই, আমার সঙ্গে পড়ে। ওর সঙ্গে নীলুদা কতদিন আমার পড়া নিয়েছেন, বেশ ভাল লোক।

আজ নীলুবাবুর সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিতে রাণীর ইচ্ছা হইল। কিন্তু বীরেনের নিকট বলিতে কেমন সঙ্কোচ অনুভব করিতে লাগিল, কি জানি যদিই বা বীরেন তার দুর্ব্বলতাটুকু ধরিয়া ফেলে!

৫

দশ বছর কাটিয়া গিয়াছে। ম্যাট্রিক পাশ করিয়া রাণী কলেজের সব গুলি পরীক্ষা সসম্মানে উত্তীর্ণ হইলে পিতা হাসিয়া বলিলেন "এবারের আব্দারটা বল্লে না রাণী ?"

রাণী নমিত চক্ষু মাটির পানে রাখিয়া হেঁট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বলিবার যে তার আর কিছুই নাই। পিতা এবার একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন "তোমার আব্দার ফুরিয়েছে, এবার আমার পালা। দেখ মেয়েদের অমতে যে নিজের ইচ্ছে মত তাদের বিয়ে দেব সে পিতা আমি নই। এই জন্য আমি এতদিন তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিনি। এখন তোমার বয়স হয়েছে, আমিও বৃদ্ধ হয়েছি, তোমার একটা উপায় করে দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য" "কেন বাবা। আমার উপায়তো হয়েই আছে।"

"দূর পাগলী! রোজগারই শুধু জীবনের উদ্দেশ্য নয়, আর তা সব মেয়েদের পক্ষে নিরাপদও নয়, পুরুষের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ তাদের চিরকালই থাকতে হবে, সেই পথে তাদের জীবনও মধুময় হয়ে ওঠে। যাক্ এখন বিবাহে তোমার বিরাগ বা অমত হয় এটা আমি ইচ্ছা করিনা।"

ছোট বেলার মত মুখরা চঞ্চলা আর সে নয়, বিবাহের কথায় শৈশবের কথা স্মরণ করিয়া তার বড় লজ্জা হইত, সে নীরবে মাথা নত করিল।

পিতা সম্মতির লক্ষণ বুঝিতে পারিয়া প্রফুল্ল চিত্তে মনে মনে কহিলেন "বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের মতি গতি ফিরিয়াছে।" শীঘ্রই একটী সুপাত্রের সন্ধান মিলিল। এ পাত্রটীও বিবাহ করিয়া লণ্ডন যাইবে, আট হাজার টাকা স্বীকৃত হইয়া রাণীর পিতা অগ্রহায়নের মাঝামাঝি দিন ঠিক করিয়া রাণীর ছোট বোন বাণীর জন্য পাত্র খুজিতে লাগিলেন। শীঘ্র বাণীর পাত্র পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল। সে রাণীর ন্যায় সুন্দরী নয় বিদ্যাবতীও নয় দুইবার আই এ ফেল করিয়া তৃতীয় বারে উত্তীর্ণ হইয়াছে। বয়সও রাণীর চেয়ে বেশী কম নয়। সুতরাং তাহার বিবাহের জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

রাণী তার পড়ার ঘরে বসিয়া একখানি বই পড়িতেছিল, কিন্তু পড়াতে মন লাগিতেছিলনা, সে চিরদিনই পণ প্রথার বিরোধী। এই বিরুদ্ধ মন লইয়া একটু আগে বহুদিনের একটী কথা স্মরণ হইবা মাত্রই মন একটু ক্ষুদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া পড়িল। পাঁচহাজার টাকার জন্য সে তার পিতার সহিত কতই না তর্ক করিয়াছিল, কত কথাই না তাহাকে শুনাইয়াছিল কিন্তু নেবার বেলায় কেউতো কম নয়, অথচ সে এখন উপায়হীনা নহে, নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিখিয়াছে। একবার ইচ্ছা হইল, পিতাকে বলিয়া বিবাহ বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু এবার পিতাকে বলিবার মত যে কিছুই নাই, বিশেষতঃ দুই ভাই এখন উপার্জ্জন শীল।

বইএর পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে ছোট একখানি চিঠি ও আর একখানি হাতে আঁকা ছবি তার চোখে পড়িল; "ত্রয়োদশ বর্ষিয়া বালিকা, কর্দ্দমে লুণ্ঠিত অঞ্চল। ভীত, চকিত, শঙ্কুচিত চাহনি, বই পেন্সিল এদিক ওদিক নিক্ষিপ্ত, ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কোঁকড়ান কালো চুল ও বদন

কর্দ্দমাক্ত। যেন কাদায় গড়া, এক সং। ছবির উপরে লেখা "দুদৃষ্টি" এ যে তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া অঙ্কিত হইয়াছে। তবেকে সে সেখানে গিয়াও ভুলিতে পাবে নাই? কানের কাছে একটা তিল, সেই তিলটা পর্য্যন্ত সেই মুহূর্ত্তে আবিষ্কার করিযা অঙ্কিত করিয়াছে, কি আশ্চর্য্য। চিত্রকর।—রাণী মনে মনে একটু, প্রশংসা না করিয়াও পারিলনা। কৌতূহল অন্তকরণে চিঠিটা পড়িয়া দেখিল "ভাই বীরেন। তুমি আমার হাতে আঁকা ছবি চেয়েছো। আমার প্রথম দৃষ্ট চিত্র যাহা আমার সারা জীবনের অবলম্বন," তাই তোমায স্বহস্তে এঁকে পাঠালুম, ছবিটা কাহাকেও দেখাইও না। তোমার দিদির এম্ এ পাশের খবর শুনলুম তিনি যে আমাদেরও ছাড়িয়ে উঠ্ছেন দেখছি। আনন্দের বিষয়। মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার 'আমিও পক্ষপাতী। 'আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘ জীবন লাভ করে, তোমরা জীবনের উন্নতি সাধন কর। 'তোমার নীলুদা।"

৬

পাকা দেখার কিছুদিন পুরেই অপ্রত্যাশিত রূপে একখানি চিঠি রাণীর 'হাতে আসিল।

সুচরিতাসু!

"রাণী দীর্ঘ দশ বৎসর পরে কি বলে যে তোমাকে সম্বোধন করবো আর অযাচিত ভাবে কি করেই যে তোমাকে চিঠি লিখবো তাই ভাবছি। 'তবুও পুরাতন সূত্র ধরে "তুমি" সম্বোধনেই লিখছি। বিশেষতঃ তোমাকে

তখন সেই ছোটটীই দেখে এসেছি। আশা করি কিছু মনে করবে না। আর করলেই বা কি ? যাকে কোন দিন সুনজরে দেখিনি, তাকে 'আজ কি করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবো তথাপি তোমার মুখ থেকে একটী উত্তর শুনতে চাই। আর সেইটীই হবে আমার জীবনের পরীক্ষা। আজয়েব চিঠিতে জেনেছিলুম, তোমাব বিবাহ হয়নি, তুমি নাকি বিবাহে বিরোধী। শুনে আমার মনে যে কি আশা ও আনন্দ হয়েছিল তা তোমায় ভাষায় জানাতে আমি অক্ষম। আজ বীরেনের চিঠিতে জানলুম তুমি নাকি বিবাহে সম্মত হয়েছো। তাই তোমার পিতা উঠে পড়ে লেগেছেন। সত্যি যদি তাই হয় তবে তোমার প্রতি আমাব এই মিনতি। আজও আমার প্রতি তোমার রাগ আছে কিনা ? সেইটী আমায় জানিও। তোমার অমতে আমি তোমায় গ্রহণ করতে চাইনে। টাকা নেবার পক্ষপাতী আমিও ছিলুম না। বাবাকে নিষেধ করতে গিয়ে হঠাৎ তোমার বীতশ্রদ্ধের কথা মনে হোল। বিশেষতঃ বীরেনের কাছে শুনেছিলুম তুমি এ বিয়েতে রাজী নও। তোমাকে দুঃখ দিতে প্রবৃত্তি হয়নি বলেই, তখন চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলুম। আর দীর্ঘ দশ বছর তোমার প্রতীক্ষায় কাল কাটাচ্ছি, কিন্তু আজ আমি শেষ মীমাংসা করে নিতে চাই। তোমার মত হবে কিনা ? "নালু" চিঠিটা বালিশের নীচে গুঁজিয়া রাণী শুইয়া পড়িল। আজ তার নিজের উপরেই রাগ হইতেছিল। ছোট বেলার কোন ঘটনা লইয়া আজ তার মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না। হায়রে অদৃষ্ট। সে তাহাকে কোন কালেই ভালবাসিতে পারে নাই। কিন্তু তার অন্তরের আকুল ভালবাসা অমানুষিক সহিষ্ণুতা সদা হাসি ভরা মুখছবি ; সবই যেন তাহার

নত করিয়া বসিয়া ছিল। গৃহখানি সুসজ্জিত, বিদ্যুতালোকের দীপ্তিতে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। দেওয়ালে সাজান অসংখ্য ছবি। ধীরে ধীরে রবীন আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল ও এক হাতে রাণীর অবগুণ্ঠণ সড়াইয়া অন্যহাতে মুখ খানি তুলিয়া ধরিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল "কি ভাবছো রাণী? আমাকে পছন্দ হয়নি না"?

বেগে মুখ ঘুড়াইতেই দেওয়ালে টাঙ্গান একখানা ছবির দিকে নজর পড়িল রাণী চমকিয়া উঠিল রবীন্ তেমনই হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "অমন চমকে উঠ্‌লে যে"। একটু উদ্ধত কণ্ঠে রাণী কহিল "ভাব্‌ছি নীলু বাবুর কথা তার সঙ্গে তোমার চেনা আছে না?"

বিস্ময়ের সুরে রবীন্ কহিল "কই না তো? কে নীলু বাবু"? "নইলে এই ছবি এল কোথা থেকে তুমি নিশ্চই সব জানো?"

"কি জানবো আমি। তোমার হেঁয়ালী?"

"আমার না তোমার?"

রাণীর ক্রোধের মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। ক্ষিপ্রহস্তে ছবিটা টানিয়া আনিয়া মেজেতে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

এই কি নববধূ? আর এই কি তার প্রথম আলাপ? অবাক বিস্ময়ে রবীন পলক মাত্র চাহিয়া মিনতির স্বরে কহিল "ছিঁড়োনা—ছিঁড়োনা লক্ষ্মিটী।" ততক্ষণে ছবিটা ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা হইয়া গেল। অপর কথা হইতে একটী বর্ষিয়সী কহিলেন "হ্যাঁরে নিলু। হল কি?"

অপ্রতিভ কণ্ঠে রবীন কহিল—"মাথায় লেগে ছবিটা পড়ে ভেঙ্গে গেল।"

"কার মাথায় লাগ্‌লো ?"

"আমার"। "আহা লাগেনি তো ?"

"না পিসিমা লাগেনি, তুমি ঘুমোও।"

অবাক বিস্ময়ে রবীনের পানে চাহিয়া রাণী কহিল "তুমি কে ?"

রবীন হাসিতে হাসিতে কহিল "তুমি যাকে দুচোখের কোণে দেখতে পার না সেই—ই কেন আমার মধ্যে কোন নূতনত্ব দেখ্‌লে নাকি ?"

"হেঁয়ালী রাখ পুরোণ বলে মনে হচ্ছে বলেই বলছি। আমার সন্দেহটা মিটিয়ে দাও না ? বলনা তুমি কে !"

(রাণীর আজকার এই আব্দারের সুরটা রবীণের কাছে বড় ভাল লাগিল। ইচ্ছা হইল, তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া আদর করিয়া বলে। ওগো আমার বুকের রাণী ! আমি তোমার সেই নীলু।) কিন্তু সে সহসা রহস্য পরিত্যাগ করিয়া অতটা পারিল না। মৃদু হাসিয়া বলিল যদি বলি, তোমার সেই উপেক্ষিত নীলু বাবু ?"

তবে রবীন্ কে ?"

"রবীনও আমার আর এক নাম্ এইটী ছোট বেলাকার আদরের নাম এবার বুঝলে তো ?"

"বুঝলুম, কিন্তু ছলনা করে বিয়ে করার তোমার কি প্রয়োজন ছিল ? কি আশ্চর্য্য বাবাও আমায় কিছু জানান্‌নি।"

"কি করে জানবে ? বিয়ের আগের দিনই দেশে পৌছেছি। আর তোমার বাবাকে আমিই নিষেধ করে দিয়েছিলুম কেন দিয়েছিলুম, তা এখন নিশ্চয়ই অনুভব কর্ত্তে পেরেছো ?" পকেট হইতে এক-

খানি চিঠি বাহির করিয়া রবীন্ কহিল "এই চিঠি টুকুই আমার বিয়ের ঘটক।" "ছিঃ ছি!' এ চিঠিও বাবা দেখেছেন তা হ'লে?"

"এতে লজ্জার কিছু নেই রাণু। এ না কল্লে সারা জীবন সন্ন্যাসী বেশে আমায় তোমার ধ্যানে কাটাতে হোত, সে দুঃখ কি তুমি বুঝতে?"

রাণীর লজ্জানত মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টি তুলিয়া রবীন কহিল "ভাগ্যিস রাণীর পাত্র. পাওয়া দুর্ঘট হয়েছিল তাইতো ভার কণ্ঠে তোমার ভাবী বরকে পরাতে পেরেছি!" "তোমার ভাগ্যে, নইলে এত শিগ্‌গীর তারা রাজী হোলো?"

"তারা রূপ গুণের ততটা ধার ধারেনা তাই আরো দুটী হাজার দিয়ে তোমাকে কিনে আনলুম," "তুমিই তাহলে টাকা দিয়েছিলে? কেন বাবা তো আরো বেশী দিতে চেয়েছিলেন?"

"তা চেয়েছিলেন কিন্তু আমি আশীর্ব্বাদ বাবদে দিয়ে এসেছি বর পক্ষও এটা জানে। তা ছাড়া ওদের অবস্থার দিক দিয়ে ওদের উপকারই হবে।"

"আচ্ছা রাণীর বর ঠিক হ'লে কি করতে? "তা হলে অনির সঙ্গে?—কিন্তু তাকি হয়! তাহ'লে যে তোমার সারদা বিলের আইন ভঙ্গ করতে হয়। তার সবে তেরো"। "যা—ও" রাণীর লজ্জিত কৃত্রিম রোষ দীপ্ত মুখের প্রতি দৃষ্টি তুলিয়া রবীন্ সহাস্যে বলিল "আমার হাতে পড়ে যে সারা জীবন তোমাকে জ্বালাতনে জ্বালাতনে অতিষ্ঠ হ'তে হবে সেই কথাটাই ভাবছি"।

রাণী সে কথা কাণে না তুলিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল "আচ্ছা এত গাল দেওয়া স্বত্ত্বেও তুমি রাগ করনা কেন?"

"তোমার গালা গালিই তো আমার গৃহ লক্ষ্মী রূপে তোমায় টেনে এনেছে রাণী? নইলে বাবা তো এক রকম ছেড়েই দিয়েছিলেন। যে দিন তোমায় প্রথম দেখি, তোমার স্বভাব সুলভ সরলতায় মুগ্ধ হয়ে পড়ি তারপর দুচো কথায় তোমার অন্তরের পরিচয় পাই।"

"তাহ'লে এতকাল যা বলে এসেছো সবই ভিত্তিহীন? তুমি দেবতা, আমি যে তোমার পায়েরও যোগ্যা নই—আমাকে ক্ষমা করো।" বলিতে বলিতে অশ্রু সিক্ত নয়নে রবীনের পদতলে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল;

রবীন্ রহস্যের সুরে বলিল "আহা কর কি? পায়ের তলায় না মাথার ওপরের যোগ্যা। তা বুঝতেই পারবে। কিন্তু তুমি যে আমাকে এত শীগ্‌গির গ্রহণ করছো সেইটাই তো আশ্চর্য্য।"

"আর আমাকে লজ্জা দিও না দেখ তুমি কি আমাকে লজ্জা দেওয়া ছাড়া আর কিছু দিতে পারনা?"

রবীন রাণীকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া আদর করিয়া বলিল "তোমাকে আমার অদেয় কিছু নেই রাণু! আমি স্বভাবতঃই একটু রহস্য প্রিয় রহস্যের ভিতরেই তোমার আবিষ্কার করেছিলুম আর তোমাকে আমি সেই চঞ্চলা হরিণীটার মতই পেতে চেয়েছিলুম আজীবন। কিন্তু এখন আর তুমি তা নও তবুও আমার সেই তৃষিত উন্মুখ কামনাকে ব্যর্থ হ'তে দিই কেন? তাই আমার সেই রাণু-

কেই উত্যক্ত করতে ব্যাকুল মন আকুল হয়ে ওঠে। ছবিটিও এঁকে রেখেছিলুম তোমার সঙ্গে রহস্য করবার জন্যে। রাগ করোনা বাণী। তার পর গম্ভীর কণ্ঠে রবীন বলিল "মাকে অনেক দিন হারিয়েছি বাবাও আজ বেঁচে নেই যে আদর করে বধূবরণ করে নেবেন। কাজেই নিজের ঘর সংসার বুঝে নিয়ে এ অভাগাকেও তোমার জীবনের সাথী করে নিও। জীবনে এই সর্ব্ব প্রথম রবীনের গাম্ভীর্য্য বাণীর চোখে পড়িল।

"কল্পনাই সত্য হল শেষে"

পাশা পাশি বাড়ী। একটু খানি তৃণ শ্যামল জমি মাত্র তফাৎ। তাই অগাধ মেলা মেশার ফলে সুধীর ও অরুণার কিশোর হৃদয় দুটী শুভ্র সুন্দর প্রীতির পুষ্প বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। শিশু সুলভ কলহ তাহাদের প্রায়ই হয়। কিন্তু পরক্ষণেই রাগ অভিমানের মেঘ ছায়া কাটিয়া হাসির দীপ্তি দেখা দেয়। আড়ির বদলে পুনরায় ভাব করিয়া উভয়ে প্রফুল্ল মনে বাড়ী ফিরে।

অরুণা এক পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। তায় বার পার হয় নাই। মা বলেন "অতবড় মেয়ে এখনো পথে পথে ঘুড়ে বেড়াতে লজ্জা করে না হতভাগী ?" কিন্তু কেই বা শোনে? প্রতি দুপুরের নিভৃত অবসরে মা তন্দ্রাভিভুতা হইবার সঙ্গে সঙ্গে অরুণা নিঃশব্দে সুধীরদের পেয়ারা তলায় হাজির হয়, সুধীরও যথা সময়ে অপেক্ষা করে, তারপর সুধীর পেয়ারা পাড়িয়া অরুণার প্রসারিত আঁচলে ফেলিয়া দেয় কখনো বা পুকুরে, মাছ ধরে। এমন করিয়া দুটি বনের পাখীর মত মুক্ত বালক বালিকা স্বচ্ছন্দে, আনন্দে, রৌদ্রতপ্ত পল্লী পথে

ঘুড়িয়া বেড়ায়। চপল চিত্ত সুধীরও অরুণাকে তুচ্ছ কারণে রাগায় কাঁদায় অভিমানিণী অরুণা ছল ছল চোখে প্রস্থানোদ্যতা হয়। অনুতপ্ত সুধীর তখন বিব্রত হইয়া ছুটিয়া যায়। কত সাধ্য সাধনার পর ডাঁসা পেয়ারার লোভ দেখাইয়া সে অরুণার অভিমান ভাঙ্গায়। অরুণার অশ্রুসিক্ত মুখে বর্ষনক্ষান্ত প্রভাতালোকের মত আবার হাসি ফোটে ; ক্ষণে কলহ, ক্ষণে ভাব।

* * * * * * *

অরুণা মালা গাঁথিতেছিল, শ্লথ আঁচলে এক রাশ সদ্য ফোটা। বকুল শেফালী যুঁথী গন্ধে বাতাস ব্যাকুল।

পিছন হইতে সুধীর ডাকিল—"অরু ! অরু। এই পোড়ার মুখী। অরুণা যেন শুনিয়াও শোনেনা। জবাব দিল না। গতকল্য সুধীরের সঙ্গে তার তুমুল ঝগড়া হইয়া গিয়াছে, সেই অভিমানে সে সুধীরের সহিত কথা কহিবেনা।

জবাব না পাইয়া সুধীর চটিয়া উঠিল। অতর্কিতে অরুণার অর্দ্ধেক গাঁথা মালাখানি কাড়িয়া লইয়া ছিন্ন করিয়া দূরে ফেলিয়া দিল। এই আকস্মিক অত্যাচারে অরুণার অশ্রুজল ছাপাইয়া উঠিল। অমন সুন্দর মালাটী... .....কতকষ্টে সে গাঁথিতেছিল, আঁচলের ফুলগুলি ছড়াইয়া সে উঠিয়া পড়িল। নিমেষে সুধীরের রোষ কঠিন মুখের ভাব বদলাইয়া স্নেহ কোমল হইয়া উঠিল, ওই দুটী সজল আঁখির কাছে তার সকল দৌরাত্ম্য হার মানে। অরুণার হাত ধরিয়া সে বলিল "কাঁদিসনে অরু—লক্ষিটী !...

অরুনা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল "কেন আমার মালা ছিঁড়ে দিলে ?"

"আচ্ছা কাল তোকে অনেক ফুল এনে দেব, যত খুসী মালা গাঁথিস্।"......

সুধীরের কাতর কণ্ঠস্বরে হাসিয়া ফেলিয়া অরুণা কল হাস্যে বলিয়া ফেলিল "কেমন জব্দ সুধীদা! আমাকে রাগাতে গিয়ে নিজেই হেরে গেলে।"

সুধীরের মন বলিল "এ পরাজয় কিন্তু তার জয় গৌরব। অরুণার ওই অশ্রু সিক্ত আঁখি যুগল, অভিমান রক্ত মুখশ্রী.........ওযে বহু যুগের কামনার ধন, সুধীর জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা অরু! তুই মালা গাঁথছিলি কেন?" অধর কোণে কৌতুক হাস্য চাপিয়া, অরুণা কহিল "বলবো কেন"...... .."বল্না লক্ষিটী!" বাধ বাধ স্বরে অরুনা বলিল "আমি, আমি ভেবেছিলাম পেছন দিক থেকে, তোমার গলায় মালাটা দিয়েই পালিয়ে যাব.........বলিয়াই অকারণ লজ্জায় রক্তিম অরুণা ছুটিয়া পলাইল।

সুধীরের কিশোর মন সহসা এক মধুর পুলকে ভরিয়া উঠিল।

পুষ্প গন্ধে ভরা বাতাস তার তরুণ চিত্তকে এক রঙিন নেশায় মাতাল করিয়া তুলিল।

* * * * *

দিন যায় বৎসর ঘোরে। দুটী কিশোর হৃদয়ে এক অজানা মধুর সম্বন্ধ গাড়িয়া ওঠে।

অরুণার পথে বাহির হওয়া এখন বন্ধ। পনেরো বছরের বুড়ো মেয়ে। সুধীর এখন কলিকাতার কলেজে পড়ে। মাঝে মাঝে ছুটীতে গ্রামে আসে।

একটী হাস্য ময়ী কিশোরী সঙ্গিনীর বিরহে মন তার সদা ব্যথাতুর। চৈত্রের দিবাবসান। পশ্চিমাকাশ রাঙ্গা।

জলভরা কলস কক্ষে অরুণা ঘরে ফিরিতেছিল, সুধীর ছুটীতে বাড়ী আসিয়াছে। তার পড়ার ঘরের জানালা হইতে পল্লী পথ বেশ দেখা যায়। আগত যৌবনা কিশোরীর দেহ লাবণ্য সুধীরকে মুগ্ধ করিল সে লক্ষ্য করিল এই একটী বৎসরে অরুণার সর্ব্বাঙ্গে কেমন একটা পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িয়াছে সেই হাস্য চপল বালিকাটী ভরা যৌবনের স্থির গাম্ভীর্য্যে সহসা যেন পরিপূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

সুধীর বই ফেলিয়া উঠিয়া গেল ডাকিল "অরু শোন একবার"

"কি বোলছো?" অরুণা সলজ্জভাবে আসিয়া দাঁড়াইল। "আর আসিস না কেন দুপুর বেলায়"?

"মা যে আসতে বারণ করেছেন।"

"বারণ করেছেন কেন?"

"আমি যে বড় হয়েছি তাই আমার "বিয়ের......" আরক্ত মুখে অরুণা থামিয়া গেল।

সহসা এক আকস্মিক বেদনার আঘাতে সুধীর স্তব্ধ বাক হারা হইয়া পড়িল।

আর কিশোর অন্তরের যে সুগোপন আশাটী তারই অগোচরে এতদিন ধরিয়া পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। আজ অরুণার অসমাপ্ত কথা শুনিয়া তাহা বৃন্তচ্যুত হইয়া ধুলায় লুটাইয়া পড়িল। "ওঃ! আচ্ছা আর আসিসনে।" সুধীর দ্রুত পদে প্রস্থান করিল।

অরুণা দীপ্তিহীন মুখে বাড়ী ফিরিল। একটা অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাস তার কণ্ঠ পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠিতেছিল।

বাড়ী ফিরিয়া সুধীর মায়ের কোলে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল— স্নেহ সিক্ত চোখে চাহিয়া মা বলিলেন "কি বাবা"? "একটা কথা বলবো মা।" "কি কথা রে?" মার কোলে মুখ লুকাইয়া সুধীর বলিল "অরুণাকে তোমার বৌ করনা মা!" শিশুর মত চপল আব্দার শুনিয়া মা হাসিয়া বলিলেন "বেশ তো বাবা তোর একটা টুক টুকে বউ আসবে আমার ওতো কতদিনের সাধ। অরুণা কেন ওর চেয়ে রূপে গুণে কত সুন্দর মেয়ে সাধা সাধি করছে?......" "কিন্তু অরুণা তো মন্দ নয় মা?" মা এবার গম্ভীর হইয়া উঠিলেন "তাকি হয় বাবা? ওরা গরীবের একশেষ কর্ত্তারও মত হবেনা—তুই আমার সবে ধন নীলমণি। ....সুধীর নীরবে উঠিয়া চলিয়া গেল।

মা পুত্রের বেদনা বুঝিয়া একটা দীর্ঘঃশ্বাস ফেলিলেন। কর্ত্তার যদি মত না হয় তবে তিনি যে নিরুপায়।

অরুণা তখন আঙ্গিনা পরিষ্কার করিতেছিল, সুধীর আসিয়া বলিল "ছেলে বেলায় একদিন আমার গলায় মালা দিতে চেয়ে ছিলে, অরুণা। আজকে তা দিতে পারবে? তা হ'লে কিন্তু আমাদের বাবা মায়ের স্নেহাশ্রয় ত্যাগ করতে হবে জেনো।......"

অরুণা সব বুঝিল। সুধীরের প্রশান্তদীপ্ত মুখের পানে চাহিয়া তার যেন কুণ্ঠা কোন দ্বিধা রহিল না। নত হইয়া সুধীরকে প্রণাম করিয়া সে বলিল "পারবো।" পিছন হইতে সহসা কে বলিয়া উঠিল

"শুভ মিলনের শাঁখটা বাজিয়ে দাও অরুর মা ?" সুধীর চাহিয়া দেখিল মা ! স্নেহ কোমল নয়ন হইতে আশীর্ব্বাদ ঝড়িয়া পড়িতেছে। বিস্মিত সুধীর বলিল "মা !—বাবা……" "সব কথা বুঝিয়ে বলাতে তিনি মত দিয়েছেন বাবা !"

তন্ময়াভিভূতা অরুণার মা শঙ্খ রবে মিলন মঙ্গল ঘোষণা করিয়া দিলেন।

"কল্পনাই সত্য হল শেষে"

কত দূরে

জাতিতে সে ডোম। তিনটী মেয়ে হইয়া অল্পদিন হইল বিধবা হইয়াছে।

নীচ জাতি হইলেও তারা ঠিক ভদ্রলোকের মতই চলিত। বাহিরের হাওয়ায় স্বাধীন ভাবে কেহ কখনো তাদের চলিতে দেখে নাই। কিন্তু আজ নিরুপায়। স্বজাতির পাঁচজনের ন্যায় আজ তাহাকে চলিতেই হইবে স্বামী কিছুই রাখিয়া যায় নাই।

দাওয়ায় বসিয়া সে কাঁদিতেছিল। ঘরে কিছুই নাই ছোট মেয়ে তন্বী যখন খাইতে চাহিবে। আঁচল ধরিয়া কাঁদিবে তখন তার অবোধ নিরুপায় মনকে কি বলিয়া প্রবোধ দিবে? "মনিয়া!" সে চমকিয়া উঠিল। সম্মুখে ফক্ক সম্পর্কে দেবর। তার লালসা পূর্ণ সতৃষ্ণ চাহনি মণিয়ার বুকে শতশেল বিদ্ধ করিল। সে যে একটু আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে সে ভরসাও কি ভগবান তাহাকে দেন নাই? স্বামীর সঙ্গে জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা সবই গিয়াছে। রাখিয়া গিয়াছে জ্বালাময় অনন্ত শোক। তাহাতেও নিবৃত্তি নাই। আরো যে কত জ্বালা সহিতে হইবে কে জানে? "মনিয়া! আজও তুই

কাঁদছিস? কত করে বল্‌ছি আমার ঘরে চল্‌ রাণী হয়ে থাকবি। উত্তরে রোষদৃপ্ত কণ্ঠে সে বলিল "রাণী হ'তে হ'লে সে ব্যবস্থা তোমায় কত্তে হোতোনা।........"হবেনা কেন? আমি যে তোকে ভালবাসি মনিয়া"। "আমায় ভালবাস? সে ভালবাসার মান একবার রাখ দেখি?" মনিয়ার অন্তরের শুভ্র আলো। ফল্গুকে পথ দেখইতে পারিল না। সে তার বিপরীত অর্থ করিয়া মনিয়ার হাতখানি ধরিয়া আবেগময় কণ্ঠে বলিল "সেই মান রাখবার জন্যেই তো তোকে নিকে করতে চাই মনি।"

এক ঝটকায় হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া মনিয়া বলিল "যাও—এখান থেকে, তোমার কোন কথা শুনতে চাইনা ফল্গু বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। মনিয়া ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল "ফের যদি ওরকম কথা আমায় বল আর গায়ে হাত দিয়ে অপমান কর তবে আমি পুলিশ ডাকবো ঠিক জেনো।"

ফল্গুরও ধৈর্য্যের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে বলিল "আমিও দেখে নেব। এত তেজ তোর কোথায় থাকে?"

বিধাতা দরিদ্র কোরেছিলেন তো রূপ দিয়েছিলেন কেন? এই রূপই মনিয়ার কালস্বরূপ পথে ঘাটে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহাকে বিপদগ্রস্ত করিতে ছাড়িল না। কিন্তু নিরুপায়, পথে তাহাকে বাহির হইতেই হইল। মরিবার সময়ে স্বামীর শেষ কথা কয়টা আজও তার মরমকোণে শেষ প্রতিধ্বনি তোলে "মনিয়া। মণি। চল্‌ছি কিন্তু যা দিয়েছিস্‌ তাকি ফিরিয়ে নিতে পারবি।"

মনিয়া আঁচলে চোখ মুছিতেছিল তখন তার উত্তর দিবার শক্তি

এতটুকুও ছিলনা। মনিয়ার অশ্রু সজল মুখের পরে স্নিগ্ধ দৃষ্টি তুলিয়া সে বলিল "জানি অনেক কষ্ট পাবে। অনেক লাঞ্ছনা অনেক গঞ্জনা সইতে হবে। তবুও এই শেষ মিনতি ইহ জীবনের খেলাই খেলা নয়। যেখানে অবিচার অত্যাচার নেই সে স্থান দুরূহ হলেও তার সহজ শ্রেষ্ঠ পথ কি তুমি বেছে নিতে পারবে না? বল মণি আমার বুকে হাত দিয়ে এ অমূল্য দানের সম্মান রাখবে" স্বামীর শেষ মিনতি অশ্রু বন্যায় কথা বলিবার শক্তি লুপ্ত। সে নিরুত্তরে স্বামীর বুকে হাত রাখিয়া শপথ. করিতেই হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল "এই টুকুর জোরেই আবার তোমার . সঙ্গে আমার মিলন হবে মণি! মণি এইটুকুর জোড়েই যদি তাকে ফিরিয়া পাওয়া যায়। তবে কেমন করিয়া সে তার শপথ প্রত্যাহার করিবে?

রাস্তা ঝাটে নিমগ্না মণিয়ার কাণে আসিল, দুইজন ভদ্রলোকের অস্পষ্ট বাণী।

"দেখ্ মেয়েটা কী সুন্দর। তোর পছন্দ হয়?" দূর গাধা। ও যে ডোম।

হোলোই বা ডোম মানুষতো? তাছাড়া লাভের পক্ষে সুবিধা অনেক খানি।

"ছিঃ এরা আবার ভদ্রলোক!" মনিয়া নীরবে চোখ মুছিয়া কাজে মন দিল। এমনি রোজই শুনিতে হয়। বাহির হইয়া যে তার কত অশান্তি, কত বিভ্রাট সে তাহা এতদিন অনুভব করিতে পারে নাই। যার জন্য আজ তাহাকে এমনি অপমান সহিতে হইতেছে। তার

পায়ে প্রাণের অর্ঘ্যরূপে বিকাইয়া দিতে চায়। তার শেষ সম্বলটুকু। হায় সে কোথায়? কতদূরে!

* * * * *

রূপের বাজারে মেয়ে তিনটীর নাম থাকিলেও সব চেয়ে মাথা বাড়াইয়া উঠিযাছিল ছোট মেয়ে তল্পী। মায়ের সঙ্গে সেও মায়ের কাজের সহায়তা করে। মিউনিসিপ্যালিটীর বাবুরা তার স্বভাব সুন্দর সরল বাক্যে ও অনিন্দ্য সুন্দর চেহারায় আকৃষ্ট হইযা মাঝে মাঝে খাবার কিনিয়া দেয়, তাই সবাইকে দিয়া নিজে খায়। মনিয়ার মাহিয়ানা মাত্র আটটী টাকা। এই দিয়াই চারজনের পেট চালাইতে হয়। বড় মেয়ে লক্ষ্মী সে জন্ম লুলো, মেজো মেয়ে শূলীর ওপর তার কাজের নির্ভর। তল্পী ও লক্ষ্মী তার কাজের কি সহায়তা করবে।

ফাগুয়ার উৎসবে ফল্গুর বাড়ীতে বড় রকমের ভোজ। উৎসবে সকলেই যোগ দিয়াছে কেবল তল্পী ও তার মা বোনেরা দেয় নাই।

প্রাঙ্গনে উনুনের উপর প্রকাণ্ড ডেগ্‌চিতে মাংস সিদ্ধ হইতেছিল। তার আশে পাশে পাড়ার সকলে হৈ চৈ করিতেছে। তল্পী ম্লান মুখে বলিল "মা। ভেকী ওখানে খাচ্চে।"

"ওদের খেতে বলেছে তোকেতো বলেনি।" বাতাসে তল্পীর ফুরফুরে চুলগুলি দুলিতেছিল। মাথা নাড়িয়া সে বলিল "না বল্লে খেতে হয় না, না?"

"না। আর না খাওয়াই ভাল ফাগুয়ায় ওসব মাংস টাংস খাওয়া পছন্দ করি না।"

"এ ছিঃ। মা আমি ও মাংস খাই না।" মণিয়া নিরামিষ খায় তল্লাও তার সঙ্গে খাইয়া অভ্যস্থ। ক্বচিৎ কখনো মাছ মাংসের যোগাড় হইয়াছে তো বরাহের মাংস এ বাড়ীতে কখনো আসে নাই। একটা মাংসের টুকরা খাইতে খাইতে ভেল্কী বেড়ার ধারে অগ্রসর হইয়া ডাকিল "তল্লী" তল্লার প্রাণ ছুটিয়া যাইতে চাহিলেও মায়ের অনুজ্ঞায় সে কথাটী পর্য্যন্ত বলিতে পারিল না। তা ছাড়া পূজার দিনে ঐ মাংসের কাছে যাইতেও তার ঘৃণা হইতেছিল। ঘরের মধ্য হইতে মণিয়ারে কাণে কল্লুর উচ্চ ডাক হাঁক শোনা গেল। সে যে কি উদ্দেশ্যে এই বিরাট ভোজের আয়োজন করিয়াছে, তা পাঁচজনে মানিয়া নিলেও মণিয়ার বুঝিতে বাকী রহিল না।

* * * * *

বাহিরে তল্লী খেলিতেছিল। দাবায় বসিয়া লক্ষীর পা ব্যথা হইয়া গিয়াছে। উঠিতেই ধপাস করিয়া পড়িয়া গেল। শূলী কুল তলায় কুল কুড়াইতে গিয়াছে। আঙ্গিনায় মনিয়া। বেতের ঝুড়িটা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। লক্ষীর পতন শব্দে ছুটিয়া আসিল, হায়রে। জন্ম নুলো চিরকালই দুঃখ সইতে হবে, তবে এ গিয়ে সে রইল না কেন মনে একবার আসতেই বুকটা ছ্যাৎ করিয়া উঠিল "না—না থাক্ রয়েছে রয়েছে। তল্লী ছুটিয়া আসিয়া দুটী টাকা দেখাইয়া বলিল "এই দেখ, কে দিয়েছে বলত।"

মনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া বলিল "কে দিয়েছেরে?" "জানিনা, আবার দেবে বলেছে।" "আবার দেবে?" ব্যাপারটা যেন মনিয়ার কাছে তেমন সন্তোষজনক বলিয়া বোধ হইল না।

সেইদিন বৈকালে তাদের দ্বারে একখানি জুড়ি গাড়ী দাঁড়াইল তল্লী কলহাস্যে বলিল "ঐ দেখ মা সে এসেছে।" কেরে কে?

বুকের মধ্যে এমনি কম্পন আরম্ভ হইল যে স্পষ্ট অনুমান হইল এ আর কিছুই নয় রোজকার অভিনয় আজও দেখিতে হইবে। টাকা দুইটী হাতে লইয়া মনিয়া বাহির হইয়া আসিল।

গাড়ী হইতে যে নামিল তার দিব্য সুদর্শন কান্তি। বিলাস বসনে ধনবানের পূর্ণ পরিচয়।

মনিয়া নাক সিঁটকাইয়া মুখ ঘুড়াইয়া নিল "তল্লী। এ টাকা কার?"

তল্লী আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিল। "দিয়ে দাও আমি না বলছি যে যা দেবে ফিরিয়ে দেবে।" তল্লী ভয়ে ভয়ে টাকা ফিরাইতে গেলে সে সহাস্যে বলিল "দিয়েছি কি ফিরিয়ে দেবার জন্যে?"

মনিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিল "দেবার মানুষের তো অভাব নেই, তাদের দিন্‌গে—দুখিনীর মেয়ে"......"দুখিনীর মেয়ে বলেইতো দিয়েছি মনিয়া। কিন্তু এ দুঃখতো তোমার থাকবে না?"

"ছিঃ। ছিঃ একি শুনিতে হইতেছে তাকে, রাগে দুঃখে মনিয়ার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ভগ্ন হৃদয় তার আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল "ওগো' কইগো তুমি কতদূরে? তোমার সম্মান রাখতে গিয়ে আজ আমার এত শাস্তি।"

মনিয়া কাঁদছো। দুঃখ কি! তোমার দুঃখ সারাতেই তো এসেছি। মেয়েদের নিয়ে চল্‌ আমার বাড়ীতে রাণী হয়ে থাক্‌বে।"

"ওঃ ভগবান। একি শোনালে?"

"মনিয়ার হাতখানি হাতের মধ্যে পুরিয়া লইয়া আবেগ পূর্ণ

কণ্ঠে সে বলিল "ভয় কি মনিয়া!—মনিয়া!" আবার সেই হাতের অবমাননা, এই হাতে যে তার শেষ স্মৃতি বিজড়িত। কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেও এই হাতের স্পর্শ—আবার তাহাকে সচকিত করিয়া কর্ত্তব্যের পথে টানিয়া নিতে প্রয়াস পাইল। হোক সে ধনী রাজাধিরাজ। তার কাছে নিজের বাড়ীতে নিজেকে অপমানিত হইতে দিবেনা, সে।

মনিয়া হাতটা সবলে ছিনাইয়া লইয়া দ্বারে খিল আঁটিয়া দিল।

গভীর বিস্ময়ে আগন্তুকের মুখে নির্গত হইল "আশ্চর্য্য।"

এমনি করিয়া স্বার্থ সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটায় সকলেই মনিয়ার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল।

লক্ষ্মী আর ঘরের বাহির হইতে পারে না, চারিদিক হইতে ইট পাটকেল আসিয়া তার কোমল অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিয়া দেয়।

শূলীর একটা কাজ ঠিক হইয়া গিয়াছিল, শত্রুরা পিছনে লাগিয়া সে আশাও নির্মূল করিয়া দিল। তন্বী মায়ের অনুজ্ঞায় কারো নিকট হইতে খাবারটী পর্য্যন্ত নেয় না। বাড়ীতে যে ডালা সাজী প্রস্তুত করিয়া দুই পয়সা উপার্জ্জন হইত, তাও আজ কাল হয় না, বিকায় না। তেল অভাবে তন্বীর কালো চুলের বর্ণ পিঙ্গলে দাঁড়াইয়াছে।

শূলীর হৃষ্ট বলিষ্ঠ চেহারা অনাহারে কৃশ হইয়া উঠিয়াছে। লক্ষ্মীতো জন্ম নুলো, অযত্নে তার বড় টানা চোখ, আরো জ্বলন্ত বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে।

সেদিন তিন জনেই রাস্তায় বাহির হইয়াছে, লক্ষ্মী ধীরে পা টানিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। মনিয়া ভয়ে আকুল। "লক্ষ্মী বাড়ী যাও মা।"

লক্ষ্মীর মুখ দিয়া অনেক খানি লালা বাহির হইয়া পড়িল। জ্বলন্ত চক্ষু টানিয়া বিকট দৃষ্টি হানিয়া বলিল "ম্না দাবনা।" "এই তোর নাম কিরে ?"

"আমা—ম্না—ম—ওক্ষ্মী—ই........."

দাঁত মুখের কি বিকট ভঙ্গী! হায় সে তো স্বেচ্ছায় করে নাই, এ যে বিধাতার দান। কর্ম্ম ফল! এও তার অপরাধ? উত্তরে দুরন্ত বালক ছুটিয়া আসিয়া বলিল "ভ্যাং চাচ্ছিস? দাড়া দেখাচ্ছি মজা।" বলিয়া ধাক্কা দিয়া চলিয়া গেল। লক্ষ্মী তা সামলাইতে না পারিয়া নর্দ্দমায় পড়িয়া গেল। নর্দ্দমায় গভীর খাত, তাতে কাদা কাদা জল। উন্মাদিনী মনিয়া ঝাঁপাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিল, পারিল না। শূলীও তন্বীকে ডাকিল।

তিনজনে বহুকষ্টে অচৈতন্যা লক্ষ্মীকে টানিয়া পাড়ে তুলিল। যেন কাদায় গড়া সংমূর্ত্তি। শিশিভাঙ্গা কাঁচ গায়ে ফুটিয়া জমাট রক্ত কাদায় মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

মনিয়া আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল কেউ সারা দিল না। দুই এক জনের চোখে পড়ায় তারাও অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল "ওর দফা রফা গ্যাছে ত গ্যাছেই নুলো মেয়েটার জন্য এত দরদ।" অঙ্গহীন অকেজো ও যে মায়ের কাছে মাণিক প্রতিবাদে তার বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল, "নুলো হইলেও সে রক্ত মাংসে গড়া মানুষ। তারও ব্যথা বেদনা অনুভূতি আছে।"

* * * * *

তারপর অনেক বছর কাটিয়া গিয়াছে। তন্বী আর লক্ষ্মী তাহাকে ভাবনা হইতে মুক্তি দিয়া অনেক দূরে কোন অজানা রাজ্যে চলিয়া

গিয়াছে। শূলীর বিবাহ হইয়াছে এক মাতালের সঙ্গে। খাবার যোগাড় করিতে না হইলেও শূলীর ভাবনা ভাবিয়া আজও তার চোখে জল আসে

শীতের 'সন্ধ্যা মেটে পাতিলের আগুণে মণিয়া তার কর্ম্ম ক্লান্ত শীতল দেহ উষ্ণ করিতে প্রয়াস পাইতেছিল সহসা কে আসিয়া নীচু হইয়া প্রণাম করিল। মনিযা মুখ তুলিয়া চাহিল। শূলী।

এতক্ষণ শূলীরই ভাবনা ভাবিতেছিল অনেক দিন তার সহিত দেখা নাই। শূলীকে পাইয়া আনন্দে মনটা সজীব হইয়া উঠিল।

"উঃ। এত রোগা—শুকনো কেনরে ?"

শূলীর নিরুত্তর গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া মনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। "ওকি শূলী। তোর কাপড়ে ও কিসের দাগ ?"

শূলী—সেস্থান 'সামলাইয়া লইতে যাইতেছিল, মনিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাকে বুকে জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। "শূলী—শূলী। হতভাগী। সবাই অমায় মুক্তি দিয়েছে তুই কেন দিলিনে।"

শূলী অবাক হইয়া গেল। যে মা নূলো রুগ্না মেয়েকে বাঁচাইবার জন্য জীবন পণ করিয়াছিল তাঁর মুখে আজ একি বাণী। শূলীর কপালের রক্ত মনিয়ার হাত বাহিয়া পড়িতে লাগিল। অশ্রু সজল কণ্ঠে মনিয়া বলিল "এমনি রোজই মারে বুঝি' দরদর ধারায় রক্ত ঝড়িয়া পড়িল। "হায় হতভাগী। কেন তোকে ডাকাতের হাতে দিয়ে ছিলুম ? আর তোকে যেতে দেব না,আট টাকার জায়গায় চৌদ্দ টাকা হয়েছে আমাদের কিসের অভাব শূলী ?"

* * * * *

শূলীও তাকে মুক্তি দিতে বসিয়াছে। রুগ্না শূলীর শিয়রে বসিয়া

সে কত কী ভাবিতে ছিল। ভাবনার শেষ নাই। সেই নর্দ্দমায় পতিতা লক্ষ্মীর ভাঙ্গা হাতখানি উঃ সে যে কি কষ্ট কি যাতনায় রাত্রিদিন মর্ম্ম-ভেদী ক্রন্দনে 'স্বেচ্ছায় মুক্তি পাইতে চাহিয়াছিল। তাই বুঝি ভগবান তাহাকে মুক্তি দিয়াছিল।

সেইটী জানিয়াও আজ আবার মুখ দিয়া সেই কথাটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। যার জন্য অভিমানে শূলীও তাহাকে 'মুক্তি দিতে বসিয়াছে। হায় ভগবান মুখের কথাটা কি সত্য সত্যই সত্যে পরিণত করিবে? সে সে কত বড় দুঃখে অশান্তিতে কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছে.সেইটি একবার ভাবিয়া দেখিলেন না সেও তো মানুষ! কত সহিবে? তাইবা কেন? তল্লা তাহাকে মুক্তি দিক্ এ কথাটা ভুলেও মুখ দিয়া বাহির হয় নাই, তবে তাকেইবা ভগবান তুলিয়া নিলেন কেন?" "আমায় মেরোনাগো, মেরো না।"

"শূলী কি বল্‌ছিস মা? আর আমি ওখানে পাঠাব না, তুমি সেরে ওঠো।"

শূলী মায়ের কথা শুনিল কি না? কে জানে সে তখন প্রলাপের মাথায় উত্তর করিল "মা আমাকে দিদি ডাক্‌ছে।" ওপাড়ের ডাক আসিয়াছে। শেষবার মা বলিয়া মায়ের কোলে শূলী জন্মের মত চোখ বুজিল।

মনিয়া আর্ত্ত চীৎকারে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া কাঁদিয়া উঠিল "অনেক হয়েছে গো! অনেক হয়েছে। এখনো কি আমার পাপের ভোগ ফুরোয়নি? ওগো!—বলগো বল, কোথায় তুমি? কতদূরে?"

প্রায়শ্চিত্ত

"ওগো! কইগো! একবার এদিকে এস!" পীড়িতা স্বামীর আকুল আহ্বানে সচকিতা উমা ছুটিয়া আসিলেন। গিরীশ শয্যায় পড়িয়া ছট ফট করিতে ছিলেন তার রোগ পাণ্ডুর বেদনা কাতর মুখের পরে সজল দৃষ্টি তুলিয়া উমা কহিলেন "কি হয়েছে গো!" "উঃ! আর পারি না।। পেটে বড্ড ব্যথা" উমা বিছানায় বসিয়া বেদনার স্থানে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। পার্শ্বস্থিত পত্নীর মুখের উপর স্থির নেত্র তুলিয়া গিরীশ স্নেহ বিগলিত কণ্ঠে—কহিলেন "আমি নিজে তো সারা হয়ে গেলুম তোমাকেও"..............উমা আকুল হইয়া কহিলেন "আমার কিছু কষ্ট হয় নি তুমি সেরে ওঠ"..............গিরীশের অবজ্ঞাপূর্ণ কণ্ঠস্বরে উমা চমকিয়া উঠিলেন "আর সেরে ওঠ।" তবে কি স্বামী তার বাঁচিবে না? পীড়ার প্রতি মূহুর্ত্তে কাহার আহ্বানে কাহার অনুজ্ঞায় স্বামী তার এত আকুল এত অশান্তি, উদ্বেগ পরিপোষণ করিতেছেন? বহুদিনের মর্ম্ম-ভেদী জ্বালায় জ্বলিয়া সে যেন বাহিরের অশান্তিকে ভিতরের গুমট জ্বালায় আরো আঁকড়াইয়া জড়াইয়া ধরিতে চায়। কি সে জ্বালা? আজ কয়মাস ধরিয়া কিসের চিন্তায় কিসের আঘাতে স্বামী তাহার এত বিব্রত এত জর্জ্জরিত, সে কি ইহার কিছুই জানিবে না? জানিবার আগ্রহ

তাহাকে প্রবল রূপে চাপিয়া ধরিলেও, উমা তাহা বলিতে পারিলেন না। তার সন্থ প্রতীতি হইয়া গিয়াছিল যে সেই আঘাতেই স্বামীর এত বড় পীড়ার উৎপত্তি। ভগবানের ইচ্ছায় ইহার উপশম হইলে তখন না হয় জানা যাইবে। আর না—জানিলে যদি অশান্তির নিবৃত্ত হয়। তবে তো আরো ভাল। পত্নীর সুকোমল করস্পর্শে গিরীশের শ্রান্ত চক্ষু দুটী তন্দ্রাবেশে বুজিয়া আসিল। হঠাৎ গভীর শব্দে গৃহ মুখরিত করিয়া তিনি লাফাইয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন "ঐবে সতু! সতু, আর কষ্ট দিস্ না। আর পারি নারে?" উমা ব্যস্ত উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে গিরীশকে শয্যায় শায়িত করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন "ও কিছুই নয়, স্বপ্ন! ব্যথা একটু কমেছে কি!" "হু" গিরীশ আর কোন কথা বলিলেন না। নিঃশব্দে পুনরায় চক্ষুদুটী মুদ্রিত করিলেন। উমা সজল নয়নে অপলক স্তব্ধ পাষাণ প্রতিমার মত স্বামীর নির্ব্বাক মুদিত চক্ষুর পানে চাহিয়া রহিলেন। এই একটু পূর্ব্বের ঘটনা, তাহাকে আঘাতের উপর আঘাত দিয়া জীর্ণ বক্ষটা ভাঙ্গিয়া গুঁড়া গুঁড়া করিয়া দিয়া যাইতেছিল। হায়! কেন এমন হইল! সতু? সতুতো আজ দুই মাসের উপর হইল মারা গিয়াছে। তখন সে পিত্রালয়ে। আর মৃত্যু বিষয়ে যে একটা অমূলক ঘটনা যেন আবছায়া শুনিয়া আসিতেছে, ইহা সত্য কি মিথ্যা সে বিচারেও সে সন্দিহান। কিন্তু কই, ইহার মধ্যে স্বামীকে পূর্ণ মাত্রায় জড়িত বলিয়া তো মনে হয় না? শুনিলেও যে সে বিশ্বাস করিতে পারে না। এরূপ ধার্ম্মিক সদাচারী, সত্যনিষ্ঠ মহৎহৃদয় যার সেকি কখনও এমন অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে পারে? উমা আর কিছু ভাবিতে পারিলেন না। চোখের কোনের সঞ্চিত অশ্রু ঝর ঝর করিয়া ঝড়িয়া পড়িল।



পাঁচ ছয়দিন পরে গিরীশের জ্বর ছাড়িল, উমা লক্ষ্য করিলেন, রোগের উপশমের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের জমা অশান্তিটা যেন আরো বিশেষরূপে তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া অধিকতর যন্ত্রনা দায়ক হইয়াছে। হয় তো এই অশান্তির চিন্তা ভাবনাটাই আবার তাহাকে পীড়িত অসুস্থ করিয়া তুলিবে? দুই দিন যাইতে না যাইতে এইরূপ পীড়ার কবলে পতিত হইলে সে যমের হাত হইতেই বা রক্ষা পাইবে কিরূপে।

যে দিন গিরীশ অন্নপথ্য করিলেন তাহার দুইদিন পরে বৈকালে উমা গিরীশের জন্য কয়েকটী ন্যাসপাতি কাটিতে ছিলেন। গিরীশ সেখানে বসিয়া একদৃষ্টে উমার নত মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। "উমা।" উমা মুখ তুলিয়া চাহিলেন "আমি আর "বাঁচবো না" ছিঃ! "ওকথা বলতে আছে?" "না থাক্‌লেও দেখো আর বাঁচবো না, মনের মধ্যে যার অনুতাপের তুষানল, এমনি করে তিলে তিলে যার অন্তর দগ্ধ হয়ে জ্বলে পুড়ে খাঁক হয়ে যাচ্ছে,—সে কি কখনো বাঁচে? কিন্তু আমি মরি তাতে ক্ষতি নাই, খোকাকে কে মানুষ করবে! তোমাকে কে দেখবে? সেই ভাবনাই আমাকে আরো আকুল আরো বিপদগ্রস্থ করে রেখেছে উমা?"

গিরিশ এক নিঃশ্বাসে এত কথা বলিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন, উমা উদ্বেগাকুলিত কণ্ঠে কহিলেন "আমার মাথা খাও। আর ওসব কথা

তুলো না। খোকার আর আমার মুখের পানে চেয়ে সব অশান্তি ভুলে যাও" গিরীশ শুষ্কহাসি হাসিয়া কহিলেন "সেটা ভুলতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র! তাও তো আমি কম করিনি। এই যে তোমাকে সব সময়ে কাছে রাখতে চাই, মনের ঐ দুর্নিবার অশান্তিটা কে, ভুলবার জন্যেই তো? কিন্তু তা পারি কই? কথায় কথায় এত কথা এত অন্য মনা এত ভুল বার চেষ্টা তবুও সবটাকে ছাপিযে ভুলে, মনের কোনে ফুটে ওঠে। সেই কথা, সেই ভাষা, সেই ছায়া। ওগো। শোন, আমি বিশ্বাস ঘাতক আমি নিষ্ঠুর, আমি ডাকাত!"........."থামো।— থামো, আর বোকোনা, অসুস্থ শরীরে এতটা সইবে না.........এই জল কয়টী খাও। আর বোকো না।" উমা অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। গিরীশ স্তব্ধ নেত্রে তাহার প্রতি চাহিয়া কহিলেন "তুমি কাঁদছো? কিন্তু এর চেয়েও বেশী কান্না একদিন তোমায় কাঁদতে হবে।"

"যাতে কাঁদতে না হয়, সেই জন্যেই তো বল্‌ছি, আমি স্বইচ্ছায় তোমার কাছে থেকে জেনে নেব কি তোমার অশান্তি?" "দাও খেতে, কিন্তু এও বল্‌ছি যখন জান্‌বে তোমার হতভাগ্য স্বামী, ডাকাত, নর-রাক্ষস, তখন এর চেয়ে বেশী কাঁদবে, এমন রাক্ষসের হাতে পড়েছো জেনে ঘৃণায়"........."তা যেন আমার জান্‌তে না হয়, এই জন্যই তোমার মুখ থেকে সব জান্‌তে চাই। জানি আমি, তুমি যা বলবে, তা সত্য চির সত্য মিথ্যার এতটুকু লেশ নেই। সেই টেই আমার কাণে অমৃতময় হয়ে ফুটে উঠ্‌বে।" গিরীশকে তার এমনই একটা বিশ্বাস ছিল যে সে কথা বলিতে বলিতে দীপ্ত গরিমায় তার সুন্দর মুখে সৌন্দর্য্যের শতসুধা ফুটিয়া উঠিল।

গিরীশ মুগ্ধ নেত্রে একবার চাহিয়া লইয়া কহিলেন "এতটা বিশ্বাস তুমি আমায় কর্ত্তে পার। তা না বল্লে হয়তো সে শ্রদ্ধার অপলাপই হবে সন্দেহ নাই, কিন্তু যেটা সত্য, চিরসত্য, সেইটাই আবার পূর্ণ ঘৃণার বস্তু, আমার মুখ থেকে জান্‌তে চাও, কিন্তু তোমার ন্যায় স্ত্রীর কাছে তাই বল্‌তে আমার মুখ ফুট্‌ছে, না বল্লে বোধ হয় ভাল হোত।" "আমিও জান্‌তে চাইতাম না। আর না জান্‌লে যদি পূর্ব্বেকার শান্তি ফিরে পাও, তবে না বল্লে।" "তাও নিরুপায়।" "তবে কাগজে লিখে দাও না থাক্ তুমি বড় দুর্ব্বল।" "সে জন্যে নয়, আচ্ছা, মুখেই বল্‌ছি।" "আজ থাক্ আজ তুমি বড় দুর্ব্বল।"

৩

আঘাতের পর আঘাত যে মানুষকে এমনি করিয়া বিকৃতায় ভরাইয়া তুলিতে প্রয়াস পায়, উমা তা একেবারে সম্যক না জানিলেও আজ তা পুরাপুরি উপলব্ধি করিলেন, স্বামীর অতীত জীবনের করুণ কাহিনী শুনিয়া। এই যে এত বড় বাড়ী, বিস্তৃত দালান। বালাখানা এগুলি যেন বিষ চারিদিকে বিষে ছাওয়া। তারই প্রতি নিঃশ্বাসে প্রতিদীর্ঘশ্বাসে ঘুড়িয়া বেড়াইতেছে। গৃহে বাহিরে, দ্বারে, প্রাচীরে, খিলানে, অঙ্গনে তারই একটা গভীর আর্ত্তনাদের প্রতিধ্বনি। ওঃ! স্বামী তবে মিথ্যা এতটা অনুতাপ লইয়া পুড়িয়া মরিতেছেন না? কেন তার এ দুর্ম্মতি হইল?

না—না তার অপরাধ কি? সে কি নৃশংস রূপে তাকে হত্যা করিয়াছে? তার আজ্ঞাতে অপরে করিয়াছে। তবু কি সে অপরাধী? অপরাধ এই যে জানিয়া শুনিয়া তারই অনিচ্ছায় পরিত্যক্ত তারই দীর্ঘশ্বাস বিজড়িত পিতার সঞ্চিত প্রাপ্ত, সম্পত্তি ভোগ করিতে প্রয়াস পাইতেছে। তা এও তো অপরাধ পূর্ণ অপরাধ, এ অপরাধের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই? উমা অনেকক্ষন চিন্তা করিলেন উপায় কি? উপায় কি নাই? স্বামী আর কতদিন দুর্ব্বিষহ মর্ম্মপীড়ায় জ্বলিয়া মরিবেন! প্রায়শ্চিত্তে কি উপসম হইবে না? প্রায়শ্চিত্তে যদি ইহা নির্ব্বাচিত হয়। আবার যদি সে পূর্ণশান্তি ফিরিয়া পায়। তবে যাক, সব চলিয়া যাক উদ্যান অট্টালিকা রাজঐশ্বর্য্য সব উধাও হইয়া যাক। বিনিময়ে ক্ষুদ্র পর্ণ কুটীর শাকান্ন ফিরিয়া আসুক। উমা অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া যেন অকুলে কুল পাইলেন। আশার উদ্বেগে বহুদিন পরে আবার মুখে সত্য শান্তির প্রতিবিম্ব ফুটিয়া উঠিল। সেদিন অপরাহ্নে উমা স্বামীর কাছে মনের কথা অকপটে ব্যক্ত করিয়া তাহার অনুমতি ভিক্ষা চাহিলেন। উমার মনে বদ্ধ ধারণা হইয়াছিল, তাঁহার অভিপ্রায়ের প্রতিকূলে গিরীশ কখনো দাঁড়াইবে না। কিন্তু আশার অনুরূপ এমন কোন প্রশ্ন বা প্রসন্নতা সেখানে ফুটিল না, দেখিয়া উমা মুসড়িয়া গেলেন। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া উমা পুনরায় স্বামীর অনুমতি ভিক্ষা চাহিয়া কহিলেন "কিগো। কিছুই বোলছো না যে।" শুষ্ক উদাস দৃষ্টি পত্নীর মুখের প্রতি রাখিয়া গিরীশ কহিলেন "তাদের কাছে গিয়ে এখন কোন ফল নেই যা গিয়েছে তা যখন ফিরিয়ে দিতে পারবে না তখন মিথ্যে তাদের রোষাগ্নিতে পূর্ণ ঘৃতাহুতি দেওয়া

বই আর কিছুই নয়। এই জন্যই আমি তোমাকে বলতে সাহস পাইনি উমা ! জানি,আমি যে বোঝা বুকে নিয়ে ভারী জেনে ফেলে দিতে যাচ্ছি, সেইটে তোমায় ও বইতে হবে। সেইটে বিষম বলেই আজ তোমার এ খেয়াল চেপেছে কিন্তু লাভ কিছুই নেই। কতকগুলি তপ্ত অভিশপ্ত কথা ছাড়া একি সহ্য কর্ত্তে পারবে।"

উমা কহিলেন "এর চেয়ে বেশী কি অভিশাপ থাকতে পারে দেব লাভ লোকসানের জন্য যাচ্ছি না, যাচ্ছি তাদের বিষয় তাদের ঐশ্বর্য্য ফিরিয়ে দিতে। অজ্ঞাতে যা ভোগ করেছি—করছি। জেনে আর তা করবো কেন।"

৪

জীর্ণ কুটীরের এক ধারে বসিয়া একটী বর্ষিয়সী মালা জপিতেছিলেন। হঠাৎ কাহার কোমল স্পর্শে সচকিতা হইয়া মাথা নত করিলেন "কে তুমি মা ?" পুত্রক্রোড়ে উমা সজল চোখে কহিলেন "আমি ? আমি তোমার দয়ার ভিখারিণী মা !" বর্ষিয়সী স্নেহ বিগলিতকণ্ঠে কহিলেন "কি মা। কি বলছো ? কিছুই বুঝতে পারছি না। এইটী তোমার ছেলে ? আহা এমনি ধারা একটী ছেলে, আমার তরুর যদি হোত তা হলে ওযে সে সর্ব্বনাশের কথাটা"......বৃদ্ধা আর বলিতে পারিলেন না, দুই চক্ষু অশ্রু জলে ভরিয়া উঠিল : তিনি অঞ্চলক

নেত্রে উমার পুত্রের পানে চাহিয়া রহিলেন ঐ দৃষ্টির সম্মুখে উমা কেমন একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। নিজের অব্যক্ত কাহিণী বলিবার যেটুকু অবসর তাহার প্রতীক্ষায় ছিল তাও নিমেষে বৃদ্ধার চোখের জলে ধুইয়া গেল। উমা হঠাৎ তার দুটী পা জড়াইয়া ধরিয়া আর্ত্তস্বরে কহিলেন "সত্যই কি মা তুমি তা ভুলতে? তবে নাও মা, আমার এই পুত্র নাও, তোমার মেয়েকে দাও। একে নিয়ে যদি তোমাদের শোকার্ত্ত চিত্তে সান্ত্বনা পাও, তবে নাও। নিয়ে আমার অভিশপ্ত, অনুতপ্ত স্বামীর বক্ষে শান্তির ধারা ঢেলে দাও। তিনি অপরাধী তাই আমিও অপরাধিনী।" বৃদ্ধার দুই চোখের সঞ্চিত অশ্রু তখনো ফোঁটায় ফোঁটায় ঝড়িতেছিল। তখনো নির্নিমেষ অপলক আঁখি দুটী বালকের প্রতি স্থির নিবদ্ধ। উমার এতগুলি কথা বোধ করিবা বৃদ্ধার কর্ণগোচর হয় নাই! তাহা হইলে উৎসুক উদগ্রীব কণ্ঠে অনেক কথা বা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন। উমা পুনরায় কহিলেন "আমার এই ছেলেটীকে তোমায় দেব, নেবে মা?" বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিলেন "কি সর্ব্বনাশ। মা হইয়া পুত্র দান। এও কি সম্ভবে? "ছি" মা! এমন অলক্ষুণে কথা কি বলতে আছে? এবার উমা কাঁদিয়া ফেলিলেন "আর কোন মার না থাকতে পারে কিন্তু আমার আছে। শোন মা শোন আমি পাষাণী। আমি হতভাগিনী। পুত্র দানে আমি জন্ম জন্ম পুত্রলাভে বঞ্চিতা হব, তবু—তবু যদি আমার স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় এই আশায় ছেলেকে দিতে চাই।"

"কিন্তু তোমার ছেলেকে পালন কর্ব্বার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত ভগবান কেড়ে নিয়েছেন।"

"সে জন্য ভাবনা নেই মা। এই সঙ্গে আমি অতুল ঐশ্বর্য্য ফিরিয়ে দেব, মনে রেখো, তাতে আমার কোন অধিকার নেই। কখনো ছিলও না।" বৃদ্ধা বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন।

৫

"একি কাকীমা যে!"

ভেজা কাপড়ে কলসী কাঁখে বিধবা কামিনী অঙ্গনে পা দিয়া বিস্মিত নেত্রে কহিল "একি কাকীমা যে।" "কি!—কি বল্লি কে—এ?" "ওগো। এ আমার খুড়শ্বাশুড়ী?" "সেই ডাকাতের বউ?"

বৃদ্ধার চোখে মুখে দাউ দাউ করিয়া রোষের অগ্নি ঠিক্‌রাইয়া উঠিল। অভিশম্পাতের বহ্নি ছুটিয়া চলিল "ওরে চলে যা! চলে যা! আমার সম্মুখ থেকে দূর হ। আমি যে আর দেখ্‌তে পাচ্ছি না।" "মা। কি বোল্‌ছো? থাম—থাম আর না—অনেক হয়েছে অতটুকু ছেলে ওর গায়েও অভিশাপ লাগবে, শোন মা, শোন আমার মুখের পানে চেয়ে এদের ক্ষমা ক'র। উমা করুণ নেত্রে কহিলেন "আমি তোমায় "মা" বলে ডেকেছি, তোমার এ দীনা কন্যাকে আর অভিশাপ দিও না মা।"

বৃদ্ধা আকুল আর্ত্তনাদে কাঁদিয়া উঠিলেন। "জানি— আর তাকে পাব না। মিথ্যা অভিশাপ, মিথ্যা অশ্রু, মি

৭

পারি না মা আমি যে সামান্য মানুষ, দেবতারা যা সইতে পারে না, আমি তা কি করে সই ?”

তরু সঙ্কোচ নম্র স্বরে কহিল “কাকীমা ! মা শোকে পাগল হয়ে গ্যাছেন, কিছু মনে কোরোনা” “মনে করবার মত সময় আর নেই, শোন তরু ! আমার স্বামীকে যত অপরাধীই মনে কর না কেন, তিনি তত অপরাধী নন ! সত্যেনকে তিনি স্বহস্তে হত্যা করেন নি যা হয়েছে তাও তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে। “কাকীমা ! আমারও মনে হয় তাই। রাত দুপুরে হঠাৎ আমায় জাগিয়ে বল্লেন “কাকা ডাক্‌ছেন যাই, তখনই আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠ্‌লো, ডান চোখ কেঁপে উঠ্‌লো। গভীর আতঙ্কে শিউরে উঠে তার হাত ধরে বল্লুম “তুমি যেও না। আমি জানি কাকা এখানে নেই”... তরুর চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া আবার কহিল “বল্ল্‌ম যেও না কাকা এখানে নেই শুনলে না আমার কথাও বল্লে বিশ্বাসী লোক বল্‌ছে কাকা আজই ফিরে এসে জরুরী কাজে ডাকছে তখুনি সে চলে গেল, হায় ! বিশ্বাসী। দুনিয়ায় এত বিশ্বাস যার সেই আবার বিশ্বাসীর বিশ্বাস ঘাতকের কবলে আপন প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়। আমার কোন কথা শুন্‌লে না সে চলে গেল। কত অনুনয় বিনয় কল্লুম, কত পায়ে ধল্ল্‌ম, কিছুতেই শুনলেনা, চলে গেল। বড় ভাল বাস্‌তো কিনা কাকাকে ? কাকীমা। পুত্র ...ও মনে হয় এতে কাকাবাবুর এত টুকুও হাত নেই।” “হাত স্বামীর পা... ...য বল্‌তে পারিনে তরু ! তবে, ভায়নক ষড়যন্ত্র আছে এটা

“কিন্তু তো... ...ত উপার্জ্জিত সম্পত্তি সতু পাবা মাত্রই তার শত্রু কেড়ে নিয়েছেন।”

অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেছিল, উনি আতঙ্কে শিউরে উঠে তা নিষেধ করেছিলেন কিন্তু তাব মস্ত ভুলের জন্যই তিনি অপরাধী। বল্‌বার ও সাবধান করে দেবার অবসর তিনি পান নি। তার সামান্য ত্রুটিতে এত বড় সর্ব্বনাশ সাধিত হোলো। যা হবার হয়ে গ্যাছে তরু। আর অভিশাপ দিও না। অজ্ঞাতে তোমার সম্পত্তি ভোগ করে যা অপরাধ করেছি, জ্ঞানে তা ফিরিয়ে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি। তরু কেঁদ না, আমার ছেলেকে নিয়ে অতীতের শোক ভুলে যাও।" তরু শিহরিয়া উঠিল। দুই হাতে চোখ মুছিতে মুছিতে রোরুদ্ধ মানা কণ্ঠে কহিল 'মায়ের বুকের ধন আমি ছিনিয়ে নিতে চাই না কাকীমা। অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, ছেলে দিতে চাইছো কিন্তু ছেলের অপরাধ একবার আমায় দেখাও দেখি? যা হবার তা হয়ে গ্যাছে কাকীমা! যাও বাড়ী যাও বিষয়, আশয়, এই খোকার। আমরা হতভাগিনী। ও দিয়ে আর কি হবে?" উমা দৃপ্ত কণ্ঠে কহিলেন "ছেলে না নিলে, ছেলে আমার! কিন্তু বিষয় কার? যতদিন না জানতে পেরেছি নিঃসঙ্কোচে ভোগ করেছি কিন্তু আর না, ইচ্ছে হয় নাও নয়তো বিলিয়ে দাও। মনে রেখো এ আমার দান নয়, প্রায়শ্চিত্ত।"

"প্রতিশোধ"

"ওরে। আগুন লেগেছেরে। আগুণ! আগুণ! চারিদিকে আকুল আর্ত্তনাদ তুমুল কোলাহলে অকস্মাৎ সুরুচির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

একে সদ্য পুত্রহারা জননী তায় সারাদিনের খাটুনী অনেক রাতে তন্দ্রাবেশে চোখ দুটী বুজিয়া আসিয়াছে মাত্র। মানু তখনো তার বক্ষে থাকিয়া তার শোক সন্তপ্ত বক্ষ জুড়াইতে প্রয়াস পাইতেছিল। পাশের জ্বলন্ত গৃহ হইতে অগ্নিশিখার বিকট হাসি সুরুচির অন্ধকার কারা কক্ষকেও অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করিয়া আসন্ন আগমনের সম্ভাবনা জানাইল।

ভয়ঙ্কর শিহরিয়া সুরুচি দ্বার খুলিল উঃ। কি ভীষণ বহ্নি। রক্ত লোলুপ রাক্ষসের মত লেলিহ রসনা বিস্তার করিয়া সর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে উদ্যত, গাঢ়ো অন্ধকারে ছাওয়া অমানিশা দিনের আলোর মত দীপ্ত হইয়া গ্যাছে "ওরে। সর্ব্বনাশ হোলোরে……...ধার করে ঘরটা তুলছি এখনো শেষ হয়নি, চোখের সামনে পুড়ে যাচ্ছেরে। হতভাগারা আগে কেন সাবধান হোসনি" "বাক্স পেটারা গুলি নিয়ে আয়না নিতু যতটা পারি রক্ষা করি।" "আরো জল—আরো জল। "এস এদিককার বেড়াটা

খুলে ফেলি।” “হায় হায়রে। ছেলেটা গেল, ছেলেটা গেল, ওকে বাঁচাতে পারলুম না। উপায় কি হবে আমার?”.........চারিদিকের আকুল আর্ত্তনাদের মাঝে স্বরুচির বক্ষে শত শেল বিদ্ধ হইল “ছেলেটা গেল। ছেলেটা গেল ওকে বাঁচাতে পারলুম না।” স্বরুচি ভাবিল “কে সে হতভাগিনী? যে বুকের ধন হারাইতে বসিয়াছে, হারাইবার তীব্র অনুভূতি আজও তার বক্ষ জুড়িয়া। যে বেদনায় সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে সেই নিষ্ঠুর বেদনার অনুভূতি আবার কার বুকে জ্বালাময় পরশ দিয়াছে। না সে তা হইতে দিবে না...... ...এত বড় একটা বিপদ অবাঞ্ছনীয় অপমৃত্যু সে ঘটিতে দিবে না। হয় তো অসম সাহসিক বলে মৃত্যুমুখী ছেলেটাকে যমের কবল হইতে টানিয়া আনা সহজ, অথচ বিপদে ধৈর্য্যহারা হইয়া অনেক সময়ে মানুষ ‘অসময়ে কালের কোলে ঢলিয়া পড়ে, লোকে বলে অদৃষ্ট। সমবেত জনতার কণ্ঠে এই অদৃষ্টের ধিক্কার এই হতাশ করুণ হাহাকার শুনিয়াও স্বরুচির মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে একটু চেষ্টা পাইলে বোধ করি রক্ষা পায় অন্তত প্রাণ বিনিময়েও।

আবার সেই করুণ কণ্ঠের ব্যথিত আর্ত্তনাদ। “বাঁচাও বাঁচাও! আমার সব যাক্ তবু”.........মর্ম্ম বিদাহী কণ্ঠের আকুল আহ্বানে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া সন্তান শোকাতুরা স্বরুচি উন্মাদের মত দিগ বিদিক্ জ্ঞান শূন্যা হইয়া ছুটিল, জনতার কোলাহল অভিমুখে, প্রদীপ্ত বহ্নি মুখে।

সেই মূহুর্ত্তে মানুর ঘুম ভাঙ্গিল। শূন্য গৃহে ভীত আকুল আঁখি তুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল “কাকীমা।—কাকী মা”। বালকের করুণ ক্রন্দন কাকীমার কাণে প্রবেশ করিল না। সেখানে হাজার কণ্ঠের মাঝে শুধু সেই করুণ কণ্ঠেরই কাতর মিনতি শোনা

যাইতেছিল, "বাঁচাও! বাঁচাও! ছেলেটাকে বাঁচাও।" "তুমি কি বোলছো? ছেলেটার মাওতো আসেনি?" "এঁ্যা কি হবে তবে এক সঙ্গে দুজনে জীবন্ত দগ্ধ হবে। ভগবান। ভগবান। রক্ষা কর।"

দিশে হারা হইয়া এক প্রৌঢ় জ্বলন্ত গৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া আকুল অশ্রু জলে ধরা অভিষিক্ত করিয়া তুলিলেন! একবৃদ্ধ তার হাত ধরিয়া সজোড়ে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিলেন "আর কেন? তারাতো গ্যাছেই সঙ্গে সঙ্গে নিজেও আত্মহত্যা করে মরবে নাকি?" গৃহস্বামী কাঁদিয়া উঠিলেন "না—না এখনো তারা বেঁচে আছে। ঘরটা একেবারে জ্বলে ওঠেনি।" অকস্মাৎ দীপ্তা মহিমময়ী তেজস্বিনী এক নারীর আবির্ভাবে সকলে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িল। কেহই তাকে বাধা দিতে পারিল না। যেন কোন্ মন্ত্রবলে সকলের শক্তি পরাভূত হইয়া গিয়াছিল। সুরুচি মুহূর্ত্তে জ্বলন্ত গৃহে প্রবেশ করিল, সদ্য জ্ঞানহারা একটী নারী তার বক্ষের নিধি বক্ষে জড়াইয়া মেঝের পরে লুণ্ঠিতা। চরিদিকে প্রজ্জ্বলিত আগুনের আভায় তার মুখে আঁকা মাতৃ স্নেহের স্নিগ্ধ রেখা, সুরুচির চোখে মুগ্ধ দীপ্তি ফুটাইয়া তুলিল। ঐ রেখা টুকুই যেন তাকে কর্ত্তব্যের পথে টানিয়া লইতে প্রয়াস পাইল। সবলে শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া নারীকে প্রাঙ্গনে আনিয়া ফেলিল। ততক্ষণে স্কাউটের ছেলেরা আসিয়া পৌছিয়াছে ......সুরুচির পশ্চাতের অঞ্চলে আগুণ ধরিয়া উঠিয়াছিল। একটা মোটা কম্বলে আম্মাৎ তাকে জড়াইয়া ধরিয়া স্কাউটবালক আগুণ নিভাইয়া দিল।

২

"বেরো হারামজাদী—কলঙ্কিনী আমার বাড়ী থেকে বেরো।"......

একি নিষ্ঠুর বাণী। ভাসুরের একি নির্ম্মম আদেশ! একে পুত্রহারা বিয়োগ ব্যথায় অহর্নিশি অন্তর জ্বলিয়া খাঁক হইতেছে তার উপর অগ্নি দগ্ধ দেহে অসহ্য যন্ত্রনা কিন্তু নারীর নারীত্বে আঘাত দিয়া একি তীব্র-তিরস্কার? উঃ। সুরুচি দ্বারে মাথা ঠেকাইয়া বেদনা দগ্ধ দেহে তীব্র-তিরস্কার নীরবে সহ্য করিতে লাগিল। ভাসুরের সঙ্গে জাও তার সুরের প্রতিধ্বনি তুলিয়া কহিলেন "মানুকে একলা ফেলে কোন চুলোয় যাওয়া হয়েছিল শুনি? আহা—কচি ছেলেটা [illegible] ভয়ে ভয়ে কোন রোগ না হয়ে পড়ে।"

"বাড়ীর ছেলে মরুক বাঁচুক তাতে আমার কি! পরের ছেলেকে বাঁচাতে যাই আহা কি আমার বাহাদুরী। তুমি বৌ না? নাকি ব্যাটা ছেলে? পর পুরুষের গা ঘেঁষতে গিয়েছো; লজ্জা সরম নেই, আক্কেল নেই দেখাও দেখি আমায় পাড়ায় কোন্ মেয়ে গ্যাছে ছুটে, নিশুতি রাতে পুরুষের গা ঘেঁষতে।"

নারীত্বের এইরূপ কদর্য্য অপমান শুনিয়াই হয়তো সাধ্বী সীতা বসুন্ধরাকে দ্বিধা হইতে মিনতি জানাইয়া ছিলেন। শিহরিয়া সুরুচি কাণে হাত চাপা দিল। কিন্তু এত করিয়াও তাদের মনের ঝাল মিটিল না। ভাসুর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এ বউকে গৃহছাড়া করিয়া তবে তিনি স্নানাহার করিবেন।

সুরুচির মনে তখন যে ঝড় উঠিয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়। হঠাৎ আশ্রয়হীনা হইয়া এ অপরিচিত বিপুল বিশ্বে সে কোথায় দাঁড়াইবে? থাকার মধ্যে এক স্বামী, তাও স্বামীর কোন নির্দ্দিষ্ট বাড়ী নাই সুদূর সহরে অজ্ঞাত কোন মেসে থাকিয়া পড়ায় নিযুক্ত তার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, আর কয়টী দিনের সবুর। সুরুচি বড় বৌয়ের পা ছটী জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রু জলে সিক্ত করিয়া দিয়া ভিক্ষা চাহিল "দিদি এখন কোথায় যাব আমি! তোমরা ঠাঁই না দিলে বল!"

সদর্পে পা ছটী সড়াইয়া লইয়া ঝাঁঝাল কণ্ঠে বড়বৌ বলিলেন "ওমা, আমি কি জানি?" "তুমি বল দিদি, ভাসুর ঠাকুরকে বুঝিয়ে—"

"কথার ধরণ দেখ, আমি বলতে যাই আর ঝাঁটার বাড়ি দিক আমার কথায়ই যেন উনি ওঠেন বসেন।" সুরুচি কাতরে কহিল "দিদি আমায় ক্ষমা কর অবুঝ বোনটী'......"কি জানি, এখন আর ঐ ঘ্যান— ঘ্যানানী ভাল লাগেনা, দোষ করবার বেলায় মনে থাকেনা, অন্নের জন্য ছেলেটা রক্ষা পেয়েছে, যেখানে প্রাণ নিয়ে খেলা, সেইখানের অপরাধ আমি মার্জ্জনা করতে পারিনে—যাও........"

তাহাকে যাইতেই হইবে একটী দিনের সবুর নয় কত কাকুতি মিনতি, শুধু দুইটী দিনের জন্য আশ্রয়ভিক্ষা তাও ব্যর্থ হইল, কি পাষাণ গো! অর্গল বদ্ধ দ্বারের বাহিরে আশ্রয় হারা ভিখারিণী সুরুচি কাঁদিতে কাঁদিতে আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিল। কি অপরাধ তার? নারী কি এতই ঘৃণ্য? দুইটী অমূল্য জীবন রক্ষার্থে পুরুষের মাঝে ছুটিয়াছে বলিয়া কি তার এমন অমার্জ্জনীয় অপরাধ? সে অপরাধের কঠিন শাস্তি সারা জীবন তাকে মৌন মুখে সহিতে হইবে......নিষ্ঠুর সমাজের অবিচার

ঘৃণাই শুধু তার প্রাপ্য।” “মা!—মা! আমার লক্ষ্মী মা। তোমার এত অনাদর? যা মানুষ কখনো করতে পারেনা তাই ভদ্রলোক হয়ে করেছে ছিঃ। এরা মানুষ না কি! এস মা, আমার ঘরে এস।”

'সুরুচি মাথা তুলিয়া দেখিল, সেদিনকার সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক সকৃতজ্ঞ নয়নে তারই অভ্যর্থনায় নিযুক্ত। অতি গভীর দুঃখে আন্তরিক 'সহানুভূতির স্নিগ্ধ পরশ পাইলে চোখের জল আর বাধা মানে না, সুরুচি ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। “কুণ্ঠা কেন মা? এস তুমি আমাব মেয়েব বয়সী আমি তোমার বড় ছেলে এসো।”

“সমাজের কাছে আজ তুমি যে জন্য ঘৃণ্য তার চেয়ে বড় কাজ আর জগতে নেই, যদি তারা মানুষ নামের যোগ্য হয়, হৃদয় বলে একটা কিছু থাকে, তবে প্রাণ বেশী কি সমাজ বেশী এ দুয়ের মীমাংসা তাদের চলবে। সুরুচি মাথার কাপড় আর একটু টানিয়া দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটী কথা বলিতে বলিতে হাঁটিতে লাগিলেন। “তোমার নামে এই এত বড় একটা মিথ্যা অভিযোগ তা মন থেকে মুছে ফেলো। যারা তোমার নামে মিথ্যা রচনা করে, মুখুজ্যে মশায়ের মন বদলে দিয়েছে, তাদের নিজেদের জীবনেই যে কত গ্লানি লুকানো তা বাহিরেব লোকের চোখে ধরা পড়ে না……ভেতরের সত্যিকারের অনুভূতি কি সকলেরই থাকে? তাই বলি মা! দুঃখ কোরো না। মানুষ যারা, তারা তোমায় সাধ্বী বলেই সুখ্যাতি করবে। আর মাথার ওপরের ভগবান তিনি তো সবই দেখেন। আমি অরুণকে লিখে দিচ্ছি। ওর একটা সুবিধা না হওয়া পর্য্যন্ত তোমার বাবার কাছে গিয়ে থাকবে। ভগবান একদিন তোমার সুখের পথ উন্মুক্ত করে রাখবেনই।”

৩

মুখুজ্যে বাড়ীর বড়বৌ যেমনই কুঁদুলে বলিয়া বিখ্যাত অন্য দিকে তেমনই সুরুচি শান্ত, নম্র আচরণে সবারই কাছে প্রিয়। এই জন্য বড় বৌয়ের কাছে সে দু'ইচক্ষের বিষপাত্র। সে হিংসার জ্বালায় জ্বলিয়া তীব্র তিরস্কার ও বিদ্রূপের বাণ বর্ষণ করে। কিন্তু সুরুচি নীরবে শুনিয়া যায়। জায়ের কথার প্রতি উত্তর করে না! বড়বৌ বিনা দোষে সুরুচির অহিত খুঁজিতে চেষ্টা পায়। সুযোগ আর মেলে না। সহসা শুভ মুহূর্ত আসিল। একেতো মামুকে একলা ফেলিয়া পুরুষের হট্টগোলের মাঝে ছুটিয়া যাওয়া তায় পাড়া পড়শী, দু'এক জনের টিট্‌কারী। সুবর্ণ সুযোগ! যারা মুখের ওপরে তাঁকে কঁুদুলী বলিতে ছাড়েনা আজ তারাই তাঁকে সুপথে টানিয়া সুরুচির অপরাধ দর্শাইয়া তার গুরু শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া দিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে অরুণ বাড়ী পৌছিল, ব্যাপার কি! সমাজের নিষ্কর্ম্মা নেতারা বাঁকিয়া বসিলেন "এই বউকে নিয়ে ঘর করলে, তাকেও এবাড়ী ছাড়িতে হইবে।"

সমস্ত শুনিয়া অরুণ স্তম্ভিত হইল। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া হঠাৎ যেন অকূলে কূল পাইয়া মুখখানি তার হর্ষ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সমাজ পতিরা ভাবিলেন তাহাদের আশা সফলতায় পরিপূর্ণ। কিন্তু সে আশা নিরাশায় পূর্ণ করিয়া দিয়া অরুণ উত্তর দিল আমার তো শুনে আনন্দ হচ্চে, দু-দুটী জীবন রক্ষা সে তো প্রশংসার কাজ ....

"আমরা তোমার বিজ্ঞ চাল শুন্‌তে চাইনে অরুণ, যা চাই তারই উত্তর দাও। এ বউ নিয়ে ঘর করবে কিনা?"

"আর এক দিক হইতে আর একজন টিট্‌কারী দিল "আজকাল কার ছেলেরা কি আর সমাজ মানবে? তাদের বৌই সর্ব্বস্ব"।

অরুণ অকস্মাৎ উত্ত্যক্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "আপনাদের যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন, এ বউ নিয়েই আমি ঘর করবো"।

"তবে বেশ এই কথা রইলো। ভবিষ্যতে আমাদের দূষতে পার্ব্বে না। শরণাপন্নও হতে পার্ব্বে না"।

"আজ হিন্দু নারী ঘরের বাহিরে পা দিয়েছে বলে, তার সম্মান ক্ষুণ্ণ করতে আপনারা দলবদ্ধ অথচ কিসের জন্য কোন বলে সে এ অসম সাহসিক কার্য্যে জীবন দিতে ছুটেছিল তা একবার ভেবে দেখেছেন কি? চাক্ষুষ দেখেও তা প্রত্যয় হয় নি। হবেও না। কোনদিন পরের নিন্দে করা আর ছল খুঁজে যারা বেড়ায় তাদের কেউ বোঝাতে পারবে না।"

"কিসের বড়াই অরুণ? প্রাণ রক্ষা? সে তো তোমার বউ না হ'লেও হোত। স্কাউটের ছেলেরা......" মিথ্যা কথা—আমি সব শুনেছি আপনাদের সমাজ মানবোনা—বিদায় নেবার বেলা এইটুকু বলে যাচ্ছি। যাকে অপরাধ মনে করে গুরু শাস্তি দিচ্ছেন সেটা অপরাধ নয়, ভগবানের তৃপ্তি!" কাহারও কথার প্রতীক্ষা না করিয়া অরুণ দ্রুত চলিয়া গেল।

"ছেলেটার কি তেজ দেখলে? এ তেজ আমরা ভাঙ্গবই। শেষে আমাদের পায়ে লুটিয়ে পড়তে চাইবে। তখন দেখা যাবে।"

বাড়ীর দ্বারও তার জন্য অর্গলবদ্ধ সে সুরুচির স্বামী, সুরুচি তার স্ত্রী এই তার অপরাধ। "অরুণ এখনো তোমার খাওয়া হয় নি ? এসনা আমাদের বাড়ীতে ?"

পথ শ্রান্ত অরুণ ফিরিয়া চাহিল, সুরুচির আশ্রয়দাতা স্নেহ সিক্ত কণ্ঠে চুপি চুপি কহিলেন "মাকে আমি দু'দিনও রাখ্‌তে পারিনি। সমাজ অবাঞ্ছনীয় হ'লেও আমি তো তা ছাড়তে পারিনে! এই দেশের ভিটেয়ই আমার জীবন যাবে। আমার ছেলে মেয়ের মঙ্গল উৎসবে এই সমাজেরই মুখ চাইতে হবে। তাই তার বাবাকে টেলিগ্রাফ করে আনিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি, নইলে ইচ্ছে ছিল তুমি একটা বিহিত করবে"।

অরুণ আনন্দে তাঁর পদধূলি লইয়া কহিল "আপনার জন্যই আজ আমার সম্মান অক্ষুণ্ণ, আজ আমি আপনারই অতিথি"।

৪

অরুণ সাব্‌রেজিষ্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া সুরুচিকে কর্ম্মস্থলে লইয়া আসিয়াছে। আবার পুত্র পাইয়া সুরুচি তার পূর্ব্ব শোক ভুলিয়াছে, তবে ক্ষণে ক্ষণে মানুর স্মৃতি উদিত হইয়া মনটা অস্থির দুর্ব্বল হইয়া পড়িত। সেই শেষ দিনেও বাড়ী ত্যাগ করিবার পূর্ব্ব ক্ষণে জড়াইয়া ধরিয়া কত কান্নাই না কাঁদিয়াছিল। একটু কোলে লইয়া শোকাতুর বক্ষ জুড়াইবারও তখন তার অধিকার ছিল না।

জোড় করিয়া টানিয়া নিয়া মা তাহাকে কত মারই না মারিয়াছিল, সেই প্রহারের কথা আবোও মনে করিয়া সুরুচির চোখে জল আসিল। হায় অবোধ শিশু তার অপরাধে সেও অপরাধী।

পুত্র কোলে লইয়া আজ সুরুচির মনে স্বতঃই উদিত হইল যম ব্যতিত কেউ তার এ বুকের নিধিকে কাড়িয়া নিতে সমর্থ হয় না কেন? আপন ছেলে বলিয়াই না? অপরের ছেলে তাই তোকে চোখের দেখা দেখিবার অধিকার টুকুও নাই, এমন কি তার খবরটুকু জানিবার আগ্রহে মন উদগ্রীব হইলেও, চিঠির উত্তরটী মেলেনা। অপরাধ তার এতই দূষণীয়? তাহারা ভুলিতে পারে তাই বলিয়া সে তো ভুলিতে পারে না। এতদূরে থাকিয়া তবু ও তো সে তাহাদের একখানি চিঠির প্রত্যাশায় তৃষিত নয়ন উন্মুক্ত রাখিয়াছে। সমাজে সে অপরাধী হইতে পারে কিন্তু চিঠি একখানা লিখিতে কি দোষ? বাহিরের লোকের নিকটে অজ্ঞাত রাখিয়াও তো মানুর খবরটা একবার দিতে পারে? সুরুচির অস্থির মন কিছুতেই শান্ত হইতে চায় না! কাহাকেও বলিয়া যে বুকের বোঝা কমাইবে সে পথও বন্ধ"। বলিলে অরুণ রাগিয়া উঠে "তোমার অত মাথা ব্যথা কেন? চিঠিতো আমিও কম লিখিনি! উত্তর না দিলে আর কি করতে বল? যাওয়াও যে বন্ধ"।

এমনি উদ্‌ভ্রান্ত মনের মাঝে অপ্রত্যাশিত রূপে হঠাৎ একখানি চিঠি আসিয়া পৌঁছিল "বোন সুরুচি! একদিন তোমাকে ভিখারিণীর ও অধম করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলাম তার প্রতিফল পদে পদে পাইতেছি। কোন মুখে তোমার কাছে অগ্রসর হইব? তবুও লিখ্‌ছি বোন্‌ উপায়

নেই, তোমার ভাসুর রুগ্ন শয্যায়। মানু শেষ শয্যায়······সুরুচির কম্পিত হাত হইতে চিঠি খানি পড়িয়া গেল। হায় ভগবান একি করলে! আমি তো এ আশা করিনি, মায়ের কোল আলো করিয়া বাঁচিয়া থাকুক, নাই বা পেল এ দুখিনী তাকে দেখিতে। তবু সে বাঁচিয়া উঠুক”······অস্থির উদ্ভ্রান্ত চিত্তে আবার চিঠিটা তুলিয়া লইয়া সুরুচি পাঠ করিল “তোমার জন্য দিন দিন তিল তিল করে তার কোমল প্রাণ কেঁদে গুমরিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছিল তার সে দুঃখ ব্যথা জানাবার পথটা পর্য্যন্ত বন্ধ করে রেখেছিলুম হতভাগিনী নিষ্ঠুর মা আমি। বোন্! কি বল্‌বো তোমায়, তুমিই প্রকৃত সন্তানের জননী, তাই পরের ছেলেকেও আপন সন্তান জ্ঞানে অন্তরের অমৃতময়ী স্নেহ সুধা ঢেলে দিতে চেয়েছিলে, ঐ টুকুর জোড়েই বিশ্বের সব ভুলে তুমি তোমার ঐ অমূল্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে ছুটেছিলে আগুণের মুখে পরের ছেলের প্রাণ বাঁচাতে। তখন বুঝিনি, হিংসার বিষে দেহ জর্জ্জরিত ছিল তাই পেটের ছেলের দুঃখ বুঝিনি আজ তাকে হারাতে বসেছি। তার মা বলেও আজ আমি নিজেকে ভাবতে পারিনে। কেবল প্রসব কল্লেই মা হয় না। মায়ের কর্ত্তব্য যে বড় কঠিন। বড় দুরূহ। মানুর শিয়রে বসে তার রুগ্ন কাতর মুখ খানি চোখের ওপরে দেখছি প্রলাপের ঘোরে শুধু তার মুখের বুলি “কাকী মা। কাকীমা তাই আশা আছে হয় তো সে আবার বাঁচবে কিন্তু তুমি আসিবে কি? না প্রতিশোধের পথ পরিষ্কার করে, আমার আশা ব্যর্থতায়ই ভরে দেবে। সুরুচি বোন্! আমি কাতরে তোমার হাতে ধরে ভিক্ষা চাইছি এস! এস ফিরে এস, আমার মাণিক কে আমার বাছাকে বাঁচাতে

দাও। এখনো আশা আমার সে বাঁচবে, আমি সমাজ চাই না, কিছুই চাই না, তোমায় চাই। পুত্র চাই রোগ শয্যায় তোমার ভাসুর পড়ে রয়েছেন, তুমি এলে আমি এ ভাঙ্গাবুকে বল পাব। তোমারও তো ছেলে আছে? মায়ের ব্যথা তুমিই বুঝবে। যাদের পরামর্শে তোমায় লাঞ্ছিতা অপমানিতা করে দূরে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম তাদের কাছেও আজ আমরা লাঞ্ছিতা, আজ বিশ্ব-সংসারে আমি একা! বন্ধু কেউ নেই। যারা ছিল তাদেরও তাড়িয়ে দিয়েছি ভগবান তো আছেন? সে শাস্তি আজ পাচ্ছি। আসিবে কি? তোমার হতভাগিনী দিদি!"

৫

'সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে একখানি পাল্কী আসিয়া ঘরের দ্বারে থামিল। বড় বৌ উৎসুক কৌতুহলী নয়ন তুলিয়া, দেখিলেন সুরুচি।—

ঘরের মধ্যে মানুর রোগ শীর্ণ দেহখানি ঝরা কুসুমের মত এলাইয়া পড়িয়াছে; সুরুচি স্নেহার্ত্ত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। "মানু! মানু! এই যে আমি এসেছি, বাবা আমার। চেয়ে দেখ কাকীমা।"

কাকীমা!—কাকীমা! আমি যাব। মা মেরেছে: কইমা কাকীমা" বালক এমনি কতকী প্রলাপ বকিতেছিল, তখন তার শূন্য দৃষ্টি কাকীমার সন্ধানে ফিরিতেছিল। "কাকীমা এসেছে। আমি আর এখানে থাক্‌বো না" তুমি এতদিন আমায় চিঠি দাওনি কেন?" সুরুচি অশ্রু সিক্ত নয়নে কহিল "বাবা। এইতো আমি বেঁচে ওঠ! লক্ষ্মী ধন আমার মাণিক......"মানু।

এই যে তোমার কাকীমা আর এই দেখ তোমার একটী ভাই হয়েছে কী সুন্দর! ব্যর্থ ডাক—ব্যর্থ আশা, বালকের প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর হইতে মুক্তি পাইয়া অনন্ত নীলাকাশে উধাও হইয়া যাইবার চেষ্টায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে।

একবার প্রলাপের ঘোরে "কাকীমা" বলিয়া তার অধর প্রান্তে ক্ষীণ হাসির দীপ্তি ফুটতে না ফুট্‌তেই সব স্থির হইয়া গেল।

বাড়ীতে তুমুল ক্রন্দনের রোল উঠিল।

বড়বৌ কাঁদিতে কাঁদিতে সুরুচিকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল "তোর হাত দিয়ে প্রতিশোধ তুলবার উপায় নেই বলেই, ভগবান তার শোধ দিলেন। তুই সতী রাণী তোকে যে অপমান করেছিলুম তারই প্রতিফলে আজ আমার এই শাস্তি।"

অধ্যবসায়ের ফল

সিগন্যাল হইয়া গিয়াছে, কিশোর অবিচলিত অকম্পিত হৃদয়ে রেল লাইনের উপর দাঁড়াইল। ঐ বুঝি গাড়ী আসিতেছে, মুহূর্ত্তে তার রক্তে মাংসে গড়া দেহটা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া গন্তব্য পথে চলিয়া যাইবে। সহসা একটার কঠিন ধাক্কায় সে উল্টাইয়া অপর লাইনে গিয়া পড়িল। বুঝিল মরণ তার নিশ্চিত নয়।

তরুণ মনে অনেক খানি আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া অসীম উদ্যমে কিশোর ফার্ষ্ট ডিভিশনে প্রথম হইয়া ম্যাট্রিক পাশ করিল কিন্তু আশাতিরিক্ত সাফল্যের উল্লাসে মুখ খানি একবার মাত্র হরষে উজ্জ্বল হইয়াই পরক্ষণে দীপ্তি হীন হইয়া পড়িল।

ব্যর্থ জীবনে প্রয়োজন কি ? ঘরে বিমাতা পিতা বিমুখ।

সংসারের অনেক খাটুনী খাটিয়াও কিশোর ছোট ভাইটীকে ক্রোড়ে লইয়া পড়িত, দুরন্ত বালক কখনো বই খাতা লইয়া নাড়াচাড়া করে

কখনো বা ছিঁড়িতে প্রয়াস পায়, কিশোর বহু চেষ্টায় তাহাকে বাধা দেয়, এই প্রকারে বাধা পাইয়া ও কিশোর অনেক রাত অবধি পড়ে। বিমাতার কটুক্তি তার কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করে, "এত রাত অবধি পড়া এত তেল পোড়ালে সংসার যে দুদিনেই উচ্ছন্নে যাবে," কিন্তু কেই বা শোনে? বিমাতার আক্রোশ আরো বাড়ে। এইরূপে প্রতিপদে বাধা পাইয়াও সাফল্যের আনন্দে একবার মাত্র মুখ খানি হরষে উজ্জ্বল হইয়াই দীপ্তি হীন হইয়া পড়িল। পিতা কোনও সওদাগর আফিসের ৭০্ টাকা বেতনের কেরাণী সংসারে কিশোরকে লইয়া পাঁচটী সন্তান এবং নিজেরা ২টী প্রাণী।

কলেজে পড়ার নামে বিমাতা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন "কর্ত্তা যা পান তা দিয়ে সংসারেই কুলুতে পারছিনে—তা আবার তোমার কলেজের খরচা কুড়ি টাকাই বা আসে কোথেকে?"

কিশোর নমিত কণ্ঠে উত্তর দিল "কুড়ি টাকা নাই ই দিলে মা, পনের টাকা দাও অন্তত আমার যাওয়ার খরচটা, তারপর টিউশানি করে আর স্কলারশিপের টাকা দিয়েই আমি চালিয়ে নেব"। সে জানিত পিতার কাছে বলিলে কোন ফল হইবে না। সংসারের সমস্ত খরচ মাতার হস্তেই অর্পিত, কিন্তু বৃথা অনুনয়ে ধৈর্য্যের বাঁধন আলগা হইয়া পড়ে, বিমাতাকে দু'কথা শুনাইয়া দেয় "আমাকে সংসার খরচ থেকে বাঁচিয়ে কষ্ট করেও যদি টাকা দিতে, তা হ'লে তা ব্যর্থ হোতোনা, আজ যদি আমার মা থাকতেন তাহ'লে তিনি আমার এই পাশের খবরে কত খুসী হতেন এবং কষ্ট করে সংসার চালিয়েও আমায় পড়াতেন। বাবাও আজ চুপ করে থাকতেন না"।

শেষের কথা কয়টী পিতার কাণেও প্রবেশ করে মাতা রাগিয়া পাড়া মাথায় করে, কি! এতদূর স্পর্দ্ধা!—আমার কথা শুনে তোর বাবা তোকে পড়ায় না? তিনি স্ত্রৈণ? এই তোমার শিক্ষা? এই তোমার বৃত্তি পেয়ে পাশ করা? আমিও বলি তুমি সতীনের ছেলে বলেই এমনি ভাব আমায়"! বলিতে বলিতে কোথা হইতে অজস্র জল আসিয়া চোখের কোণে দেখা দিল। তার পর ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কিশোর ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া পড়িল, পরক্ষণেই পিতা আসিয়া গলা ধাক্কা দিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিলেন। "বেরো—হতভাগা! তুই মলে একটা আপদ যায়"।

মরনেও বাধা কিশোর স্থির করিল, জীবনে তাহাকে উন্নত হইতে হইবে। এতখানি বাধা-বিঘ্ন সহিয়া মধ্য পথে সে হাল ছাড়িয়া দিবে না।

রেল লাইন ধরিয়া সে হাঁটিতে আরম্ভ করিল। দুই তিনটী ষ্টেশন পার হইয়া একটা ষ্টেশনের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইতেই একজন ভদ্রলোক "কুলী—কুলী রবে চীৎকার করিতে লাগিলেন। দূর হইতে একটা কুলী দৌড়িয়া আসিবার পূর্ব্বেই কিশোর হাত বাড়াইয়া বলিল "আমায় দিন"। ভদ্রলোক তার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া সাশ্চর্য্যে বলিলেন "তুমি।—তুমি নিবে!"

"হ্যাঁ—আমিও মুটে"।.........

"কিন্তু তোমায় তো মুটের মত লাগছে না" ?

অশ্রু সজল কাতর কণ্ঠে সে বলিল "পেটের দায়ে ভদ্রলোককেও মুটে হতে হয় মশায়। আমার কেউ নেই"। সুগৌর কিশোর সুন্দর কান্তি। ভদ্রলোকটীর মনে করুণার সঞ্চার হইল।

তিনি প্রসন্ন দৃষ্টিতে কহিলেন "মোট তোমায় বইতে হবে না,—কুলীই নিয়ে যাক্। তুমি আমার সঙ্গে এস"।

পথে যাইতে যাইতে তিনি বলিতে লাগিলেন "পেটের দায়ে অনেকেই অনেক কিছু করে বটে, কিন্তু তোমার মত ছেলেকে তো কখনো মুটে-গিরি করতে দেখিনি। হঠাৎ মোট বইতে সখ হল কেন ?"

"বলেছিই তো—পেটের দায়ে। তা ছাড়া আমি আরও কিছু আশা রাখি! কলেজে পড়তে চাই"। "কলেজে পড়তে চাও।—তুমি কতটা পড়েছো" ? বিস্মিত নয়নে ভদ্রলোক কিশোরের পাণে চাহিলেন "আমি ম্যাট্রিক পাশ করেছি"। "তবে মুটে গিরি করে কলেজে পড়বার কি তোমার সময় হবে ? না তুমি মোট বইতে পারবে ?"

মোট বয়ে কিছু টাকা করে আমি শুধু কলকাতা যাবার ভাড়া ও খাওয়া পড়ার সংস্থান করতে চাই—তারপর টিউশানি করে সামান্য কিছু পেলে এবং স্কলার শিপের টাকাতেই আমার চলে যাবে"।

প্রৌঢ় ভদ্র লোকটী প্রশংস মান দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে চাহিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া সাহ্লাদে বলিলেন "বাহাদুর বটে ছোকরা: তবুও মোট বয়ে পড়তে চেয়েছিলে ? কিন্তু মোট কি তুমি বইতে পার্ব্বে ? তোমার চেহারা দেখেই তোমাকে অপারগ জেনে হটে যেত।"....

"অপারগ জেনে হটে যাবার আগেই সত্তা পেয়ে নিশ্চয়ই এগুতো।

তাতে আমার ও লাভ ছিল "বলিয়া কিশোর হাসিয়া উঠিল। ভদ্রলোকটিও সে হাসিতে যোগ দিলেন, পরে বলিলেন "কলিকাতায় আমার ছোট ভাই তার ছেলে মেয়েকে পড়াবার জন্য প্রাইভেট্ টিউটর খুঁজছে। মেয়েটী দশ বছরের ছেলেটী সাত। তা এদের একবেলা পড়িয়ে তোমার পড়াটা চলবে। কলকাতায় আমি থাকলে আমার বাসায় থেকেই তুমি পড়তে পার্ত্তে। এক বেলা টিউশানিও তোমায় কর্ত্তে হোতো না।"

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, নরেন্দ্র নাথ চাটার্জ্জী এড্‌ভোকেট। তিনি তাহার একমাত্র দুহিতা ও একমাত্র পুত্রের শিক্ষার জন্য গৃহ শিক্ষক খুঁজিতে ছিলেন। কিশোরের কচি মুখ ও সুগঠিত তনু দর্শনে তিনি মুগ্ধ হইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট যাহা অবগত হইলেন, তাহাতে তাহার মন করুণায় গলিয়া গেল। সেই দিন হইতে কিশোর সেই বাড়ীতে থাওয়া পড়া ও দশ টাকা বেতনে গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত হইল।

কিশোর এতটা অনুগ্রহ আশা করে নাই। সে লজ্জিত হইয়া বলিল "প্রয়োজনের অতিরিক্ত আমি কিছুই চাইনে। খাওয়া পড়াই যথেষ্ট।" "তোমার পরিক্ষার ফিস্ হাত খরচ ইত্যাদিতে ও টাকা অতিরিক্ত নয়," কিশোর বিনম্র বচনে কহিল," আমার স্কলার শিপের ২০৲ টাকাতেই আর সব খরচ চলে যাবে।"

কিশোরের বিদ্যানুরাগ ও নম্র স্বভাবে সে শীঘ্রই সকলের প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিল।

অরুণা ও সতুকে দুই ঘন্টা পড়াইয়াই কিশোর ছুটী পায়, বাকী সময় উহাদের সহিত গল্প করিয়া, খেলিয়া বেড়াইয়া ও নিজের পড়া পড়িয়া কাটায়, তথাপি বাড়ীর কাহারও যেন সেদিকে খেলায় নাই।

অরুণার মাতা সহৃদয়া ও শিক্ষিতা রমণী—তিনি কিশোরকে পুত্রাধিক স্নেহের চোখে দেখেন—স্বহস্তে, নয়তো অরুণাকে দিয়া কিশোরের খাবার পরিবেশন করিতেন। চাকর বা ঝি দ্বারা পরিবেশনে পাছে দরিদ্রের খোঁচা তাকে আঘাত দেয়?

দশম বর্ষীয়া চঞ্চলা অরুণা আসিয়া অধ্যায়ন রত কিশোরকে বলিল "আচ্ছা কিশোর দা!—তুমি এত পড়তে ভালবাস কেন?" কিশোর কি উত্তর দিবে, ভাবিয়া পাইল না। দশ বছরের বালিকার পানে সে কখনো মুখ তুলিয়া চাহে নাই। আজ অকস্মাৎ চাহিতেই, কোথা হইতে জলের ধারা আসিয়া দুই গণ্ড প্লাবিত করিয়া দিল। অতটুকু মেয়ে—কিশোরের ছাত্রী, তার সম্মুখে চোখের জল ফেলিতে কেমন সঙ্কোচ উপস্থিত হইল। সে তার অলক্ষ্যে চোখ দুটী মুছিয়া লইয়া বলিল "আমার মার বড় ইচ্ছে ছিল, আমি বড় পণ্ডিত হই—বিলাত যাই—আজ মার কথাটাই মনে পড়ছে অরুণা। আর একদিন পড়েছিল যে দিন আমার সমপাঠী বন্ধু বিলাত যেতে উদ্যোগী হয়ে আমাকেও যাবার উৎসাহ দিয়েছিল"। সপ্তম বর্ষীয় সতু বলিল, "তবে তুমি গেলে না কেন কিশোর দা"? অতটুকু ছেলের কাছে অভাব দর্শাইতে কেমন লজ্জা হইল "আমার যে যেতে নেই, সতু"। অলক্ষ্যে দ্বারের ফাঁক হইতে অরুণার [illegible]

কথাগুলি শুনিয়া গেলেন। তাঁহারই শিক্ষায় ইহারা কিশোরকে অগ্রজের মত দাদা বলিয়া ডাকে এবং শ্রদ্ধা ভয় ও আব্দারে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। মাতৃহারা হইয়া অবধি এত আদর সে আর পায় নাই। তাই বাড়ীর সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে তার মন সর্ব্বদা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

আই, এ পাশ করিবাও সে স্কলার শিপ পাইল এই শুভ খবরটা পিতার নিকটে জানিতে পারিয়া অরুণা সব্ব প্রথমে কিশোরকে জানাইতে ইচ্ছুক হইয়া তাহার নিকটে গিয়া বলিল, "কিশোর দা! কি দেবে বল? যদি তোমায় একটা সুখবর দিই?"

"আমার যা সাধ্য, তাই দেব"।

"তুমি আই এ তেও প্রথম হয়ে পাশ করেছ। বাবা বলেছেন তোমায় বিলেত পাঠাবেন।" বলিয়া অকারণ লজ্জায় রাঙিয়া অরুণা দ্রুত চলিয়া গেল।

দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকাকে অকারণ লজ্জায় রাঙা হইতে দেখিয়া, কিশোর আশ্চর্য্য হইয়া গেল। চঞ্চলা বালিকা সর্ব্বদা খেলা ধূলা লইয়াই ব্যস্ত, আর নিজেও দরিদ্রের সন্তান বলিয়া সর্ব্বদা ইহাদের নিকটে নিজেকে 'সঙ্কুচিত, নমিত করিয়া রাখে। আজ অরুণার এত লজ্জা পাইবার কারণ কি? তাহার পিতাই বা তাহাকে বিলাত পাঠাইবেন কেন?, কি উদ্দেশে? একি ছেলে মানুষের কথা? না কি?

বহুদিন পূর্ব্বেকার উৎপাটীত আশাটী আবার তার অন্তরে গজাইয়া উঠিল—যদি তাই হয়!"

বি, এ পাশের খবর আর অরুণা দিল না। দিল সতু। সে শুধু সে খবর দিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, আরও একটা খবর দিল যা কিশোর কোন দিন কল্পনায়ও আনিতে পারে নাই "দিদির ম্যাট্রিক একজামিন হয়ে গেলেই তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে তোমায় বিলেত পাঠাবেন কিশোর দা। বাবাতো তাই বল্লেন। দু দুটো সুখবর দিলুম, এখন আমায় কি খাওয়াবে বল।"

দুই বৎসর পূর্ব্বে অরুণার অকারণ লজ্জা ও বিলাত পাঠাইবার কারণ আজ কিশোরের চোখের সামনে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আজ সে উপলব্ধি করিল কেন অরুণা তাহার নিকট আর পড়িতে আসে না। সতু বলিয়াছিল "কিশোরের পড়ার ক্ষতি হইবে বলিয়া স্কুলের একজন শিক্ষয়িত্রীকে অরুণার গৃহ শিক্ষয়িত্রী রূপে নিযুক্ত করা হইয়াছে। না পড়িলেও পরিবেশনের 'সময়ে অরুণার সহিত দেখা হইত; কিন্তু একদিনও সে অরুণার মুখের দিকে ফিরিয়া চাহে নাই বা দেখিতেও ইচ্ছুক হয় নাই।

বিবাহের কথায় সে আনন্দিত ও হইল না—দুঃখিতও হইল না—এমনি নির্লিপ্ত উদাস ভাব লইয়া সে সর্ব্বদা পাঠে নিযুক্ত যেন জগতে—তার—ঐ একই উদ্দেশ্য—একই কাম্য!

*　　*　　*　　*　　*

কন্যা দায় গ্রস্থ কিশোরের পিতা যখন কন্যার বিবাহের ভাবনায়

ভাবিয়া নিরাশ হইতে ছিলেন ; তখন একখানি তরুণ মুখচ্ছবি, তাহার নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠিয়া তাহাকে আরও ব্যথিত অনুতপ্ত করিয়া তুলিল। আহা ! আজ যদি সে থাকিত তাহা হইলে এমন করিয়া বিবাহের ভাবনা ভাবিয়া তাহাকে আকুল হইতে হইত না তো ? স্ত্রীর পরামর্শে সে কি দুষ্কর্ম্মটাই না করিয়াছে—আজ যদি কিশোরের মা বাঁচিয়া থাকিতেন। তবে তো এমন করিয়া কিশোরকে হারাইতে হইত না ? নিজের বুদ্ধিকে শত ধিক্কার দিয়া বৃদ্ধ অনুতাপের অনলে জ্বলিয়া মরিতে ছিলেন।

সেদিন খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে হঠাৎ একদিকে তার নজর পড়িল "এড্‌ভোকেট নরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জীর জামাতা কিশোর কান্তি মুখার্জ্জী বিলাত হইতে আই. সি, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিতেছেন।"

তাঁরও ছেলের নাম "কিশোরকান্তি মুখার্জ্জি।" কিন্তু অত বড় নামজাদা লোকের জামাই হইয়া যে সে বিলাত হইতে আই, সি, এস পাশ করিয়াছে এ আশা তিনি করিতে পারিলেন না। আবার চোখের জল হু' হু' করিয়া পড়িয়া বুক ভাসাইয়া দিল।

* * * * *

কিশোরের বিবাহযোগ্যা ভগিনীর বিবাহের কথা পাকা করিতে ঘটক আসিয়াছিল। ইতি পূর্ব্বেই বর পক্ষীয়েরা কন্যা দেখিয়া পছন্দ করিয়া গিয়াছে। পাত্র দোজবর—বয়স পঞ্চাশের উপর ; প্রায় ষাটের কাছা কাছি।

...বম বর্ষীয় একটী ছেলে বাহিরে দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল—স্বপ্না

সে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল; একটী পুরুষ ও একটী মহিলা তাহাদের বাড়ীর দিকে আসিতেছে—অবাক বিস্ময়ে সে হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিল। নবাগত লোকটী তাহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল। "তোমার নাম কি খোকা?" "হাবু।"

অধীর আনন্দে আগন্তুক তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। হাবু বিরক্ত ভরে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া পিতার নিকট ছুটিয়া গিয়া সংবাদ দিল—"বাবা। দেখবে এস, কারা এসেছে।"

মুখ তুলিবারও অবকাশ হইল না। পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া কিশোর বলিল, "বাবা!—মা—কোথায়?"

সঙ্গে তার বিবাহিতা পত্নী, রূপবতী। তন্বী, তরুণী।

"মোক্ষ সাধন" (রূপক)

তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে ওপাড়ে জঙ্গল আর ঘনঝোপ। দিনের আলো তার ভেতর প্রবেশ পথ পায় না। সন্ধ্যার অন্ধকার সেখানে আরো নিবীড় হয়ে ফুটে ওঠে। তার ভেতর যে পাখীটা থাকে সে অনেক গুণ শীত বর্ষা দেখে ফেলেছে। প্রকৃতির এই নিত্য পবিবর্ত্তনের ভেতর সে কি পেলে জানিনা তবে একদিন কুয়াসাচ্ছন্ন হিমের বাতাস লাগা শীতের প্রভাতে, তার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হোল সে ঠিক করলে ভগবানকে পেতে হবে। পাখী ভাবলে গান গেয়ে বেড়ানোই ত জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়, শুধু ওড়ার আনন্দে উড়ে বেড়ালেও ভগবানকে পাওয়া যায় না। জীবনের মধ্যে ভগবানকে পেতে হ'লে চাই কৃচ্ছ সাধন। সেই দিন থেকে পাখী ওড়া ছেড়ে দিলে, গান গাওয়াকে সে পাপ বলে ভাবতে লাগলো। তার সঙ্গিনী তার বিমর্ষতা ও স্ফূর্ত্তি হীনতা দেখে তাকে ত্যাগ করে চলে গেল সে যে নিতান্তই বনের পাখী। তার মনের ভেতরটা যে গান গাওয়া আর উড়ে বেড়ানোর আনন্দেই ভরপুর। পাখী একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বল্লে যাক্ একটা মায়ার বাঁধন কাটলো।

শীত গেল ক্রমে বর্ষা এলো। সম ব্যথী ধরণীর কৃশ কোমল বুকখানির উপর প্রকৃতির আকুল করা অশ্রু সায়র ঝর ঝর করে ঝরে পড়তে লাগলো। নদীর পাড়ে জীর্ণ বট গাছটায় যে নবীন মুঞ্জরিত শাখাটা সবনীচে মাথা বাড়িয়ে অবিশ্রান্ত জলধারায় ভিজতে থাকে, তারই উপরে বসে গভীর চিন্তায় আপনাকে ডুবিয়ে দিয়ে পাখী, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটায় একাকী।

"অদূরে তার 'সখা সখীরা স্বাধীন আনন্দে ছুটাছুটী করে, জলে ভেজে, 'তারপর সাঁঝের আঁধারে চারিদিক 'আচ্ছন্ন হবার আগেই—মুখ ভরা হাসি—আর বুক ভরা শান্তি নিয়ে নিজ নিজ বাসায় ফেরে। 'তাদের দিকে তাকিয়ে পাখী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে.........মনে মনে ভাবে, কী—মূর্খ!

পাখীর উড়ে বেড়াবার ইচ্ছা বা ক্ষমতা নাই দেখে একদিন এক ব্যাধ তাকে ধরে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে খাঁচার ভেতর পুরে রেখেদিলে। পাখী ভাবলে এইবার বেশ একটা নিরিবিলি জায়গা পাওয়া গেল। নিশ্চিন্তে ভগবানের ধ্যান করা যাবে। কিন্তু দুইদিন খাঁচার ভেতর কাটিয়ে যখন ভগবানকে পাওয়ার কোন উপায় ঠিক হোলো না, তখন পাখীর এই মানুষের তৈরী খাঁচার ভেতর বাস ও মানুষের দেওয়া খাবার খেয়ে জীবন যাপন করা অসহ্য হয়ে উঠলো। এর চেয়ে তার কাছে, তার স্বেচ্ছায় উড়ে বেড়ানোটা বেশী বাঞ্ছনীয় বলে বোধ হতে লাগলো।

একদিন আবার দরজাটা একটু খোলা পেয়ে, সে উড়ে চলে যাচ্ছিল, এমনি সময়ে ব্যাধের ছেলে, তাকে দেখতে পেয়ে ধরে তার ডানা দুটো কেটে দিলে।

মোক্ষ সাধন (রূপক)

এমনি করে উড়ে বেড়ানোটাকে সে পরিহার করতে চেয়েছিল তা আপনিই তাকে ছেড়ে গেল।

পাখী কিন্তু ভগবানকে পেলেনা। এখন পাখী ব্যাধের বাড়ীতে দাঁড়ে বসে বসে ব্যাধ বালকের শিখানো বুলি পড়ে, কিন্তু ভগবানকে পেতে যে তার কত দেরী সে কথা আর তার মনেও হয় না।

"সুখী"

১

আমাদের নূতন বাড়ীটা যিনি ভাড়া নিলেন, তাহার নাম সতীশ বাবু!

সে দিন আমি আমার দিদির সঙ্গে নূতন ভাড়াটীয়ার পরিবারকে দেখতে গেলুম।

আমরা যাবার আগে সে বাড়ীটাতে আরও অনেক মহিলা আসর জমিয়ে বসেছিলেন।

পাড়ার মধ্যে পরিমলের রূপের খ্যাতি ছিল, সে পর্য্যন্ত বাদ যায় নি।

সে বাড়ীতে দেখবার একটী জিনিষ ছিল অপরূপ রূপ লাবণ্য-বতী একটী তরুণী—। সেটী—সতীশ বাবুর ভাই ঝি!

তরুণী তার চম্পক অঙ্গুলীর সাহায্যে কাপড় কোঁচাচ্ছিল, তারপর সব কাজ সেরে চুল বাঁধতে বস্‌লো। এর মধ্যে একটীও কথা কই নি, অবাক হয়ে তার কাজ-কর্ম্ম দেখছিলুম। আমার এই মুগ্ধ চাহনি

বোধ করি তাকে লজ্জা দিলে। তাই সে বল্লে "কি দেখ্‌ছেন ? "তুমি কি সুন্দর ?" এর বেশী ভাষা বেড়ুতেই চায় না তার রঙীন্ অধরে মধুর হাসি ছড়িয়ে বল্লে "সত্যিই" আমি সুন্দরী নয় ? তুমিই বল ভাই ?

ভারী ভাল লাগ্‌ছিল তাকে, বুঝতে পারলুম "তুমি" সম্বোধনটা ঠোঁটের কোণে এগিয়ে এলেও সাহস করে বল্‌তে পারে নি।

"ঠাট্টা করছো কেন ভাই ? আমিই না হয় কানা, বিশ্বের সবাই তো আর তা নয় ?"

"তুমিই বা কিসে ? কম যাও ভাই ?"

"ছাই রূপ ওর ঐ শুভ্র নবনীত পা দুটীর যোগ্যও নয়। বিধাতা যত সৌন্দর্য্য ওকেই দিয়েছিলেন তার শতের একাংশও নই।

গামছা টানা পাতা একেবারে ভুরুর উপরে এসে পড়লো—বিধাতার সৌন্দর্য্য সম্ভার শুভ্র হাতের নৈপুণ্যতায় লুপ্ত হতে চায়। চোখে যেন ভাল লাগে না বললুম "ওকি, করছো ? কপাল যে ঢেকে গেল। তা ঢাকুক না"। "তোমার তো সখ কম নয় বিধাতার সৌন্দর্য্য এড়িয়ে যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছো।—তাতে ক্ষতি ছাড়া লাভ নাই। দেখ্‌তে ভাল দেখায় না"। "নাইবা দেখাল ভাল, যার জিনিষ সে যদি ভাল দেখে, তবে তা কি আমার করা উচিত নয় ? তুমিই বল ভাই ! এর ওপরে আবার কথা কি ? তরুণী বিবাহিতা।

২

বাসায় এসেছি পর দিদি বল্লেন "ও বাড়ীর বৈঠকে অনেক রূপসী তো জমেছিল, বল্ দেখি কে বেশী সুন্দরী" ? "সতীশ বাবুর ভাই ঝি"। পরাক্ষাচ্ছলে পরিহাসের সুরে দিদি বল্লেন "আহা ! কি আমার চোখরে। পরিমলের কাছে ও কি" "পরিমল খুব সেজে এসেছে বলেই ওকে খুব সুন্দরী বলতে হবে নাকি ? আমি কিন্তু ঐ ময়লা শাড়ী পড়া মেয়েটীকেই জগতের সুন্দরী বলে মেনে নিয়েছি।

জগতে হয়তো ওর চেয়ে আরও সুন্দরী থাক্তে পারে কিন্তু আমার চোখে যখন এখন পর্য্যন্ত পড়েনি তখন ওকেই বলতে হয় বৈ কি ? দাদ এক গাল হাসি হাসিয়া বলিলেন "ঠাট্টাও বোঝ না সত্যি ওর মত সুন্দরী আমি কোথাও দেখিনি" ।

পরদিন সাঁতার কাটছিলুম, ওপাড়ের ঘাটে মেয়েটী স্নান করতে নেমেছে।

বললুম "এস না এদিকে ?" "কাজ আছে যে" ? সত্যি এক রাশ কাপড়। "তুমিই এসনা ভাই ! ওপাড়ে গিয়ে ওর কাজের সাহায্য করলুম তারপর দুজনে সাঁতার কাটতে লাগলুম।

হাতের স্পর্শে আমার শিহরণ জাগে
গোল গাল নরম হাত যেন মাখনের গোলা—

অবাক হয়ে মুখের দিকে চেয়ে থাকি, এত রূপ। বৈকালের স্নিগ্ধ হাওয়া উপভোগের লোভ সামলাতে অক্ষম হয়ে রোইরের প্রাঙ্গনে

দাঁড়িয়ে ওদের বাড়ীর দিকে চেয়ে রইলুম। হঠাৎ পাশেই এক তরুণের আবির্ভাব, সঙ্কোচে মাথা নত হয়ে এল। ছেলেটী পাশ কাটিয়ে চলে গেল। চেয়ে দেখি ঐ বাড়ীতেই ঢুকলো।

ও বাড়ীর কেউ হবে মনে করে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছি। কিছুক্ষণ পরেই সে আবার ফিরে এল, এবারও পাশ কাটীয়ে চলে গেল।

সূর্য্য অস্ত প্রায়। ল'ল চেলি পড়ে সন্ধ্যা বন্দনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। বাড়ী ফিরবার আগে ঐ দিকে চাইলুম সেই মেয়েটী। তাদের দ্বারে দাঁড়িয়ে বহুদূর দৃষ্ট তরুণের পানে অপলক নেত্রে চেয়ে আছে। চোখের কোণে দুফোটা অশ্রু! এগিয়ে গিয়ে বল্লুম "ভাই! ঐ ছেলেটী কে?" তাড়াতাড়ি চোখ দুটী মুছে বিজলীর মত একটু হাসি টেনে বল্লে "আবার কে?" বুঝলুম না—উৎসুক আঁখি তার টানা চোখে তুলে চাইলুম।

বলতে বোধ হয় লজ্জা করছিল পাড়াগেয়ে মেয়ে। বুকের ওপরে হাত রেখে বল্লে "এই খেনের সর্ব্বস্ব। স্বামী! কি আশ্চর্য্য কতখানি সংশয় থেকে মুখ দিয়ে আমার কথাটা বেড়িয়ে পড়েছিল। সরলা বালা তা বুঝতে অসমর্থ হয়ে বল্লে "কেন ভাই? আশ্চর্য্যের কি দেখ্‌লে?" হঠাৎ বলে ফেল্‌লুম "তোমার সঙ্গে যে তার একটুও মানায় না ভাই তুমি কত সুন্দরী আর সে"……আমার মুখ সবলে চেপে ধরে সে বল্লে "ছিঃ! ও কথা বলতে হয় না, আমিই তার অযোগ্যা—।"

৩

অযোগ্যা কিনা শুয়ে শুয়ে তাই ভাবছিলাম, ছেলেটী বিশ্ব গরীব, তার ওপরে রূপবান ও যদি হোত তবুও যোগ্য অযোগ্যের বিচার চলতো আমায় লোকে রূপসী বলে, ওকে দেখবার আগে আমার যে বল ভরসা ছিল, আজ তা একেবারেই লুপ্ত।

সেই আমিই যখন দৈন্যের পাকে হাবু-ডুবু তখন ঐ ছেলেটীকে আর কি বলে ওর রূপের যোগ্য বলি

যাহোক মেয়েটীর সুখ্যাতি না করে পারলুম না। রূপ গুণের বিচার নেই মনের আসনে যাকে দেবতা বলে বরণ করে নিয়েছে, প্রেম প্রীতি ভালবাসার অর্ঘ্য তার চরণে নিবেদন করে সে যেন অসীম সুখী— অসীম সৌভাগ্যবতী।

বাইরে হাসি গল্পের ফোয়ারা ছুট ছিল দ্বারের সবুজ পর্দ্দাটা সড়ে গিয়ে তার চোখে আমার চোখ পড়ে গেল সেদিনের দৃষ্ট সেই তরুণ, রূপসীর স্বামী আমার দাদার বন্ধু।

সেদিন সন্ধ্যার পরে আমরা ভাই বোনে মিলে খুব গল্প জুড়ে দিয়েছি হঠাৎ দাদা বল্লেন "দেখতো ওরা কি সুখী। উৎসুক আঁখি তুলে বল্লুম "কারা".? "ঐ রূপসী মেয়েটী আর তার স্বামী ক্ষিতীশ। জানিস্ এদের কি ভালবাসা ক্ষিতীশ সেদিন বলছিল, ও যে মেসে থাকে তাইতে নাকি ওর বৌ ভারী দুঃখিতা"......"কেন দাদা! দুঃখিতা কেন? আর মেসেই বা ওর স্বামী থাকে কেন?" "ওর নিজের কাকা

নয়; তা ছাড়া শ্বশুর বাড়ীতে সহজে কে থাকতে চায়"? "তাই বল। আমিও ভাবি! রোজই সন্ধ্যার সময়ে ওদের বিদায়ের পালা কেন এত করুণ হয়ে ওঠে"। "কি রকম। কি রকম! ব্যাপারটা খুলেই বল্লুম, দাদা হেসে বল্লেন "আর জানিস্ ক্ষিতীশ বলছিল মেসের মাছ মাংসের চেয়ে ওর বৌয়ের শাক ভাত খেতেও নাকি ওর তৃপ্তি। বৌটিও দেখ, কেমন নিজের ভাতের অর্দ্ধেক খেতে দিয়ে স্বামীর রসনা চরিতার্থ করতে প্রয়াস পায়। বটে! এতদূর। পরদিন রূপসী তরুণীকে খুব বিরক্ত কর্ত্তে লাগলুম। ওর বাক্স পেটারা খুঁজে চিঠি পত্র পড়তে সুরু করলুম মেয়েটী নিরুপায়। প্রথমে বাধা দিতে বেশ চেষ্টা পেয়েছিল, শেষটায় ব্যর্থ মনোরথে মিনতি ভরা কণ্ঠে বল্লে ভাই। পোড়োনা, সংসারের কথাও যে থাকে এতে।"

বললুম "যদি কথার ঠিক উত্তর দাও"?

"কি?"

তোমার স্বামীকে নিজের ভাগের অন্ন আধপেটা খেয়ে তুলে দিয়েছিলে! কেন দিয়েছিলে?"

"তুমি কি করে জান্‌লে ভাই"?

"তোমার স্বামী আমার দাদার কাছে বলেছে" ঠোঁটের ফাঁকে লজ্জা ছড়িমা হাসি ফুটিয়ে তরুণী বল্লে "দেখেছো কি দুষ্ট? আমি কিন্তু এজন্য তাকে"......"তাকে গোলাম করে রাখবে না কি" "ছিঃ! ওকি বলতে আছে? আমি তাঁকে অনুযোগ দেব"।

"পরশু ভাই! কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গিছিল, বল্লেন এত রাতে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না, খেয়েও আসিনি। বল্লুম থাকো

না আজকের রাতটা। হেসে বল্লেন "আমার জন্যে তো আর রান্না করনি! থেকে গেলে হয় তোমাকে এতরাতে আবার কষ্ট করে রাঁধতে হবে নয়তো না খেয়ে থাকতে হবে! তার চেয়ে ফিরেই যাই, আমি রাগ করে তার হাত দুটী চেপে ধরে বল্লুম তুমি থেকে যাও, দুয়ের একটী ও আমায় করতে হবে না, ভাত বেশী আছে। অর্দ্ধেক খেয়ে হঠাৎ হাঁড়ীটা দেখতে চাইলেন। আমি প্রাণ পণে লুকিয়ে রাখতে চাইলুম ফল হল না কিছুই, মিথ্যে কেন ভাড়াচ্ছো বলেই আধপেটা খেয়ে উঠে পড়লেন। আমি এমনি হতভাগিনী ভাই, পেটটা ভরে স্বামীকে খাওয়াতে পারিনি।" তরুণী থামলে বল্লুম "তুমিই সুখী ভাই। ঐ আধ পেটা খাওয়ার মধ্যেও যে কতটা তৃপ্তি তা তোমার স্বামীই জানেন। "হাঁ ভাই তিনিও তাই বলেন আর এও বলেন, তাঁর তৃপ্তিতে আমারও তৃপ্তি হওয়া উচিত।"

৪

হাস্‌না হানার একরাশ গন্ধে আকুল হয়ে বাগানে ঢুকলুম। কয়েকটী খোপা ছিঁড়ে খোঁপায় পড়লুম পেছন দিক থেকে কে এসে আমার চোখ টিপে ধল্লে, নরম হাত ধরেই নামটা বলে দিলুম। চোখ খুলে দিয়ে বল্লে বাঃ রে। বেশ মানায় তো"! অপরাধীর মত বল্লুম "কি?" "এই ফুল গুলিতে তোমাকে বেশ মানাচ্ছে, আর সত্যি ভাই তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।"

তাই রূপ আর কেউ বল্লে শোভা পেত কম্ম তো সইতে পারতুম কিন্তু সেরা সুন্দরীর মুখ থেকে এ অপবাদ কি করে সই?

দারুণ অভিমানে চোখ সজল হয়ে আসে। খোপা খুলি খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম—মেয়েটী অবাক হয়ে চেয়ে রইলো।

মুহূর্ত্তে গভীর লজ্জায় মনটী ভরে উঠ্‌লো এ অভিমান কার ওপরে! এ যে চোরের ওপরে রেগে ভুঁয়ে ভাত খাওয়া।

লজ্জায় তরুণীর সুন্দর মুখ খানি রাঙিয়ে উঠ্‌লো অপরাধীর মত বল্লে" আমায় ক্ষমা কর ভাই?" ক্ষমা? এ বলে কি! "কিসের ক্ষমা ভাই!" তুমি ফুলের ভূষণে সেজে ছিলে আমি এসে তোমার আনন্দের ব্যাঘাত......"ব্যাঘাত ঘটাওনি ভাই! বিশ্বের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য এই ফুলের মধ্যে তা আমাদের অঙ্গে শোভা পায় না। আমি ভুল করেছিলুম, যার অঙ্গে শোভা পায় 'তাকেই সাজাব, এস ভাই পড়িয়ে দিই"।

"না ভাই মার্জ্জনা কর, আমার দেবতার অনুমতি ছাড়া পড়তে পারিনে। বড্ড চটে গেলুম ওর দেবতা তো একটী গাধা যার সৌন্দর্য্য জ্ঞান নেই। উল্টে বিশ্বের অমলিন সৌন্দর্য্যে হাত দিয়ে তাকে কুৎসিৎ করে তুলতে প্রয়াস পায় তার আবার অনুমতির অপেক্ষা?

আরো রাগ এই জন্যে, ওর ভুরুর ওপরের পাতাটী মুখের সৌন্দর্য্যকে যেন জোড় করে অধিকার করে বসেছে দিনের দিন।

ওর ওই ঢুম ঢুমে খোঁপাটী, আর পাতা কাটার ছিরি, আমায় এমনি রাগিয়ে তোলে যে ওর দুঃখ ব্যাথাটী পর্য্যন্ত ভুলে যাই।

সে দিন ওর স্বামীকে মনে মনে গাধা বলে অজস্র বকুনি দিয়ে

মুখ ফুটে অতটা বলতে না পাল্লেও যে কথাটী বল্লুম তাতে লাভ হো তোলনা মাঝের থেকে ওর মনে ব্যথাটাই দেওয়া হোল।

ওর অশ্রু সজল করুণ আঁখির ইঙ্গিত আমার সারা জীবনের উপদেশ ও পাথেয় হয়ে রইলো।

"তোমার দেবতার সৌন্দর্য্য জ্ঞান থাকলে তো! তার জন্য আবার অপেক্ষা অনুমতিই বা কেন?" তার অশ্রু সজল করুণ—চাহনি থেকে উত্তর পেয়েছিলুম "শাল গ্রাম শিলা কালোই থাকে, তার রূপ গুণের বিচার নেই। আসল খাঁটী জিনিসের অনুসন্ধানেই লোকে তার পূজা করে। ঐকান্তিক তাই সাফল্যের সৃষ্টি। মেয়েটী বাস্তবিকই সুখী। সে নিজে রূপবতী বলে রূপবানের আকাঙ্ক্ষা কখনো করেনাই তা ওর দেবতার প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তি দেখে বুঝতে পেরেছিলুম অজ্ঞানে ওকে কি ব্যথাটাই না দিয়েছি।

লোকে সুখ খুঁজে বেড়ায়। সুখ কি। মনকে পরিষ্কার রেখে যতই সুখ মনে করা যায়, ততই তৃপ্তি।

আশ্চর্য্য রূপ গুণ ঐশ্বর্য্য। এক কালে সবই বিকিয়ে দিয়েছে, ঐ নির্গুণ কুরূপ ছেলেটীর পদতলে নিজের জন্য কিছুই রাখেনি। তাকে ভালবেসে তার আদেশ প্রতি-পালনেই যেন সে অসীম সুখী।

ওর মত মন যদি সবারই হোত তা হোলে কি বিশ্বে এত হাহাকার অশান্তি ঘটতো?

"আশীর্ব্বাদ"

পাশাপাশি বাড়ীতে তরুণ তরুণীর বাস। চোখের আলাপ তাদের যথেষ্টই ছিল। মুখের আলাপ কখনও হয় নাই, যদিও তাতে সুবিধা ছিল অনেকখানি। অন্তরের আগ্রহ মাখা শত প্রশ্ন ফুটিয়া উঠিত তরুণীর চোখের কোণে। "ওগো!—কে তুমি? কোথায় বাড়ী? কি কর?" এই নীরব ভাষার উত্তর সে কিছুই পায়নি—পাইয়াছে কেবল তার করুণ নয়নের উদাস চাহনি। প্রতিদানে তুমি কি দিলে? কি দিব? কিছু নাই ওগো! আমি চির দুখী। "তবু যাক্ এতটুকু পেয়েছি আচ্ছা এত কাজ কেন কর? তোমারও তো মা আছে"

সে জানিত না এ তার বিমাতা এবারও তার চোখের সামনে প্রতিভাত হইল ঐ নিমেষ হারা অচঞ্চল আঁখি দুটী আর তাহা হইতে গড়াইয়া পড়িল। কতকগুলি সঞ্চিত তরল অশ্রু! অপর দিক হইতে কোন উত্তর আসিল না সে দুটী পূর্ব্বের মতই স্থির অচঞ্চল, তেমনি জলভারে অবনত! বোধ করি ইহাই তাহার ভাষা! "ওগো দয়াময়ী! তুমিই এ অভাগার দুঃখ বুঝেছো তাই প্রত্যহ করুণা নয়নে চেয়ে থাক জীবনে আর কিছুই চাইনি—শুধু এইটুকু—এইটুকু চাই—এ থেকে আমায় বঞ্চিত ক'রোনা!

২

সই সুরবালার বিবাহে নিমন্ত্রিতা তরুণী আহার করিতে বসিয়াছিল।

"আরো চাই" চারিদিকে হৈ চৈ বিরাট আন্দোলনের মাঝখানে কাহার আহ্বানে চকিতে মুখ তুলিয়া চাহিল দৃষ্টি বিনিময়ে লজ্জায় সে মাথা নিচু করিল। এতগুলি খাবারের উপরেও "আরো চাই" বাণীটাই তাহাকে অধিকতর বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছিল সেই সঙ্গে কথা বলিবার শক্তিটাও যেন লুপ্ত হইয়া পড়িল, পরিবেশনকারী মৃদু হাসিয়া আর কয়েকটা কাঁচাগোল্লা দিয়া চলিয়া গেল "দেখ্‌লে মা। এতগুলো খাবার থাক্‌তে—তা তুই মানা করলেই পারতিস্?" "দেখছে খাচ্ছিনা... মিষ্টি তোর অপ্রিয়। সেতো জানে না বিশেষতঃ তুই যে সুরর সই!

কথাটা তরুণীর মনঃপুত হইল না সুরর বন্ধুতো কয়জনই আছে, তাহাদের পাতে কি এত জিনিষ পড়িয়াছে। বিরক্তি ও লজ্জায় তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল। "ওরে কর্মী ছেলেটাকে ডেকে দেতো।" হাত মুখ প্রক্ষালনে নিযুক্তা তরুণীর কর্ণে প্রবেশ করিল "নিরু! কর্মী ছেলেটাকে ডেকে দেতো! এই কর্মী ছেলেটাকে। অতি পরিশ্রমী কর্মঠ না হইলে কর্মী নাম কেহ কিনিতে পারে না কে সে দেখিবার আগ্রহ তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল। "অরুনদা জ্যাঠামশায় ডাকছেন" "আমাকে।"

"হ্যাঁ তোমাকেই"।

"তুমি ভুল বল্‌ছো নিরু। এই মাত্র তার হুকুম···তবু তোমাকেই ডেকেছেন নইলে কর্ম্মী ছেলে···অরুণ দ্রুত চলিয়া গেল। ওঃ হরি। এই নাকি কর্ম্মী ছেলে? পরিবেশন যে বিধিমতে করতে পারে না তার আবার এত বড় আখ্যা'। সংসারে কর্ম্মী আর কেহ নাই নাকি! পতিত অভুক্ত খাদ্যের প্রতি একবার চক্ষু বুলাইয়া লইয়া তরুণী হাসিতে হাসিতে কহিল "ঐ দেখ মা কর্ম্মী ছেলে—আহা কি আমার কর্ম্মী গো।"

শেষের কথা কয়টী জননীর কর্ণগোচর হইয়াছিল কিনা তাহা তাহার কথায় অনুধাবিত হইল না। "কর্ম্মী যে তার ভুল এতটুকু নেই?"

"এইটুকু ছেলে।"

"এইটুকু" "তা বইকি! ষোল বছরে এত খাটুনী কেউ খাটিতে পারে না স্বভাবটাও বড় মধুর। আপন পর জ্ঞান নেই—এই জন্যই সব জায়গায় তার আদর।" পান চিবাইতে চিবাইতে তরুণীর চক্ষু অকস্মাৎ অপর কক্ষের দ্বার প্রান্তে নপতিত হইল—সেই স্থান। এই একটু খানি পূর্ব্বে সে যেখানে আপনাকে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছিল, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া অশ্রু সজল নেত্রে তাহারই পানে চাহিয়া সেই—সে। এই একটু খানি পূর্ব্বে ইহাকেই যে বিদ্রুপ বাণে বিদ্ধ করা হইতেছিল, তখনও পরিচিতের আকুল আহ্বান দিকে দিকে প্রসারিত হইয়া অন্তরে তীব্র কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়া তুলে নাই। সে মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া ফুটিয়া ছিল তার ঠোঁটের কোনের স্নিগ্ধ হাসিটুকু।

ওমা! এ যে পরিচিত-চির পরিচিত। পরিচিতের স্মৃতিরূপে সাক্ষী

রূপে ঐ যে দুটী বিষাদ করুণ আঁখি জল ভারে নিপীড়িত। অবসর প্রতীক্ষায় সে যে ঐ খানে দাঁড়াইয়া শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছে—তার নীরব চাহনি আপাততঃ যেন তাই বলিয়া দিতেছে।

৩

সঙ্গিনীর বাড়ী হইতে প্রত্যাগত তরুণী গলির মোড় ফিরিতেই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল অরুণ তাহার একেবারে কাছটী দিয়া চলিয়া গেল। এত নিরাপদ, নির্জ্জন স্থান তথাপি উভয়েই নীরব। উভয়ের মনে একটা প্রবল ঝড় বহিয়াছিল, অথচ কেহ কাহাকেও কোন কথা বলিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছিল না। বাড়ীর দরজায় পা দিবা মাত্র মনের কোনে ধিক্কারের একটা ছায়া পাত হইল একটী কথা বলিলে বোধহয় ভাল হইত শুধু একটী কথা সে ততক্ষণে নয়নের অন্তরাল হইয়া গিয়াছে।

আর চার দিন পরে তরুণীর বিবাহ। সে এ বিবাহে সুখী কি না? কোথায় কেমন হইবে? আপনার চঞ্চল অশ্রান্ত মনটাকে 'কেবলি বুঝাইতে প্রয়াস পাইতেছিল। বিবাহের অস্তিত্বতা যেন তাহাতে লুপ্ত হইয়া পড়িতেছিল।

চঞ্চলমতি ছোট ভাইটী থাকিয়া থাকিয়া কেবলি তাহাকে উত্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছিল "ওদিদি। তোর বিয়ে—বর আসবে ধচাং

মাথায় দিয়ে।" দিদিকে ক্ষেপাইতে না পারিয়া সে তাহার স্খলিত বেণী টানিয়া উত্যক্ত করিতে লাগিল। "উঃ! লাগছে যে মুখের কথায় বুঝি হোলো না। তবু দাড়িয়ে রইলে যে বাঃ! ভারী জ্বালাতন কল্লে যে অণু!—ওকি? উঃ! দাঁড়া—মজা—দেখাচ্ছি।" দৃঢ় মুষ্টিতে বালকের হাত ধরিয়া তরুণী তাহাকে দড়ি দিয়া একটা গাছের সঙ্গে বাঁধিল।

"ওকি। একে বাঁধা হচ্চে কেন!' তরুণী চমকিয়া উঠিল। সম্মুখের গবাক্ষে একবার দৃষ্টি তুলিয়া লইয়া লজ্জায় সে মাথা নীচু করিল "আহা। ব্যথা পাচ্ছে যে কচি হাত।" একদিকে সস্নেহ ও সহানুভূতি জড়িত কোমল স্বরে অণুর পক্ষ পাতিত্ব আর একদিকে তিরস্কারের তীব্র খোঁচাটা তাহাকেই যে বিদ্ধ করিতেছে—শুধু ঐ একটী কথায়।

'মুহূর্ত্তে হাতের বন্ধন খসিয়া পড়িল অভিমানে তরুণীর চক্ষু টলমল করিয়া উঠিল। বালকের অপরাধের গুরুত্ব লইয়া তীব্র তিরস্কারে যতই না তাহাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিক্ তথাপি 'ভাষা তাহার ফুটিবে না।

অন্তরের রুদ্ধ আবেগ আর তাহার চাপা রহিল না। চোখের কোণের সঞ্চিত অশ্রু একেবারে ঝড়িয়া পড়িল। বহুদিনের পুরাতন একটী কথা সহসা জাগিয়া উঠিল "এ বুঝি তারই প্রতিদান!"

সুরবালাকে বিবাহ সাজে সজ্জিত করিতে করিতে তরুণী কহিয়াছিল "নূতন মানুষ পেয়ে ভুলিস না ভাই।" তদুত্তরে সুরবালা কহিয়াছিল "এমন দিন তোরও হবে তখন দেখা যাবে কে কাকে ভোলে!" "সে তো পরের কথা।" "বড় জোড় ছ'মাস।" "তোর মুখে আগুন।" সেই দিন [illegible] হাতে পাইয়া সুরবালা আজ তাহাকে মনের সাধে

সাজাইয়া কহিল "কিলো শান্তি। মুখে আমার কোনটা পড়েছে। আগুন!—না ফুলচন্দন" উত্তর না পাইয়া সুরবালা দুই হাতে তাহার মুখ খানি ধরিয়া তুলিল। "আমি তো কথা রেখেছি এবার দেখাবো"...গলার স্বর বাঁধিয়া যাইতেছিল তথাপি কষ্টে আত্ম-সম্বরণ করিয়া শান্তা কহিল "কখ্খনো না"।—"এতক্ষণে কথা বেড়িয়েছে, আমি তো ভেবে ছিলুম বুঝি "শ্যামচাঁদের চিন্তায় মন প্রাণ ডুবেছে। "ও কি লো! তুই কাঁদছিস্? এর চেয়েও বেশী ঠাট্টা আমায় করেছিলি—ভেবে দেখ্ দেখি! "না লো না" গলার স্বর একেবারে ভারী। তরুণী ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। এক হাতে গলা জড়াইয়া অপর হাতে চিবুক তুলিয়া আদরে সুরবালা কহিল "ছিঃ শুভ দিনে চোখের জল ফেলতে নেই! আমাকেও সাজিয়েছিলি! এমন কান্না তো কাঁদিনি? সঙ্গিনীর প্রবোধ বাণী তাহার ক্রন্দন রোধ করিতে পারিল না বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক কান্নাই কাঁদিতে লাগিল। "ছিঃ! কাঁদেনা—শুভ দৃষ্টির সময়ে চাইবি কি করে? এক্ষুনি যে তোকে নিতে আসবে?" "শোন্ শোন্।—শান্তা! এমন ছেলে মানুষী করেনা—ঐ দেখ্— দাদারা আসছে চন্দন টন্দন সব মুছে গেল যে! "একি কাঁদে কেন?" চমকিয়া শান্তা দুই হাতে চোখের জল মুছিতে প্রয়াস পাইল আর একজন রহস্য করিয়া কহিল,ভাল করে মুছে নে। কার্ত্তিক তুল্য বর এসেছে দেখিস্ শুভ দৃষ্টিটা যেন ফাঁক না যায় "না হে—না আজ-কালকার মেয়েদের তা শেখাতে হয় না" সুরবালা বলিল "আর ছেলেরা নেহাৎ সাধু"! একটী প্রবীণা কহিলেন "আজ কালের মেয়ের সঙ্গে শান্তার তুলনা হয় না এখে কেঁদেই অস্থির। তায় তোরা কাটা ঘাঁয়ে নুনের

ছিটে দিচ্ছিস্"। ঐ অনিন্দ্য সুন্দর মুখে মুক্তা ফলকের ন্যায় অশ্রুকণা অরুণের চোখে সৌন্দর্য্যের ছবিও প্রীতির নিদর্শন আঁকিয়া দিতেছিল। ঐ রূপের তুলনায় বহু মূল্য রত্নাকর কি।

"চন্দনের ফোঁটা একেবারেই মুছে গ্যাছে, এগিয়ে আয় ভাই আর একটু ফুটীয়ে দিই," "থাক্‌না—সময় চলে যাচ্ছে"। অরুণদার কি গরজ, ভাগ্যিস নিজের বিয়ে নয়—" এতগুলি দৃষ্টির সমক্ষে তরুণীর মাথা তুলিয়া বরের পানে চাহিতে পারিতেছিল না। উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনো পরি দারুণ সঙ্কোচ প্রতিপদে তাহাকে বাধা দিতেছিল "শান্তা! চা—না—চাইতে হয় যে"। "ছিঃ শান্তা! এমন করতে নেই—চেয়ে দেখ্" তথাপি শান্তা মাথা তুলিল না। সকলের অলক্ষে অশ্রু সজল আনত মুখ খানি মুছিতে লাগিল "জীবনে এই শুভ মুহূর্ত্ত আর কখনো ফিরে আস্‌বে না। প্রসন্ন দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দেখুন"। তাই তো জীবন মরনের সঙ্গীরূপে প্রেম প্রীতি অর্ঘ লইয়া আজ যাহাকে বরণ করিতে হইবে যাহার সেবার পদে পদে আপনাকে নিয়োজিত রাখিতে হইবে, সে স্বামী, সে যে গুরু, চিরারাধ্য। এই শুভ সময়টী যে তারই জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, এর চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ আর কিছুই নয়, সে যে ইহাই চায়।

অঞ্চল কোণে অশ্রু মুছিয়া অধরে জোড় করিয়া হাসি ফুটাইয়া তরুণী মুখ তুলিয়া চাহিল।

৪

স্বামীর পা দুটী ক্রোড়ে লইয়া টিপিয়া দিতে দিতে তরুণী কহিল "জীবনে বড় রকমের একটা অপরাধ করেছি, তা তোমার কাছে না বলা পর্য্যন্ত মনটা হালকা হচ্চে না।" "কি অপরাধ ?" "আমি একজনকে ভাল বেসেছিলাম"..."বেশ তো"। "বারে—বেশ তো বললে হবে না। মনে করেছো এ আমি ঠাট্টা করছি"......"ঠাট্টা বইকি ? স্বামীর কাছে মুখ ফুটে কেউ এ কথা বলতে পারে না।"

"না গো না—এ ঠাট্টা নয় সত্যি ! জীবনে বোধ হয় এত ভাল কাকেও বাসিনি"। "আমাকেও না" ! সে আর এক রকমের ভালবাসা, ঠাট্টাই কর, আর যাই মনে কর এ আমি সত্যি করে বলছি মনে হোত যুগে যুগে কত যুগে যেন সে আমার কত পরিচিত। সে যেন আমার কি ছিল ! তার ঐ বড় টানা চোখ দুটী ধরে চিনবার চেষ্টা অনেক করেছি। কিন্তু চিনতে পারিনি দেখবার আকাঙ্ক্ষা এত হোত অনেক দেখেছি তবু আশা মিটতো না কিন্তু পাবার আশা এতটুকু করিনি তাতে প্রেমের অমলিন সৌন্দর্য্যতা কি লুপ্ত হোতো না ? আর দুঃখ ও যে ছিল যথেষ্ট"।

"ঠিক বলেছো শান্তা। যথার্থই তুমি প্রেমিকা, নইলে স্বামীর কাছে আজ অকপটে অপরাধ স্বীকার করতে পারতে না। সরলতার প্রতিমূর্ত্তি তুমি ! এ তোমার অপরাধ নয় তৃপ্তি—চির মুক্তির পথ"

৫

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে একখানি চিঠি আসিল তরুণীর হাতের উপরে।

"আমি কে? পাগল! পাগল নয় তোমার···ছেলে? ছেলে নই, তোমার ভাই। যাহাকে দেখিলে একদিন ভাইয়ের মত নয়,পরের মত নয়, পরিচিতের মত বোধ হইত কিন্তু লজ্জা আসিত, কেন আসিত জানি না, ভগিনী আমি হতভাগ্য! বাল্য হইতে মা ডাকিতে শিখি নাই। মাতৃ নিহিত অবাধ স্নেহের কোমল পরশ অভাগার দেহে সিঞ্চিত হয় নি তাই তোমাকে মা বলিয়া ডাকিতে পারিলাম না। মার্জ্জনা করিও। সেই অব্যক্ত ভাষার নীরব চাহনি তৃষিত, চকিত, অশ্রু সজল নেত্র দুটী আজও প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে ঐ দুটীর সঙ্গে কবে কোথায় কোন যুগে দেখা হয়েছিল স্মরণ করতে পারিনি সে—কত দূরে? চিন্তে পারিনি সে—কে?

শান্তা ভগিনী আমার! তুমিই এই হতভাগার দুঃখটা অনুভব করেছিলে তাই তোমাকে আজ হৃদয় নিহিত একটী কথা উপঢৌকন দিতে আসিয়াছি শুধু একটী কথা।

আমি জানি যাহা আমি বলিব সে বিষয়ে তুমি আমা হইতে অধিকতর অভিজ্ঞা। তথাপি তোমার করুণার অনুকূলে উৎসর্গ করিলাম। যদি গ্রহণ কর তবেই কৃতার্থ হইব।

সেই অযাচিত জিনিষটী এই :—

১। স্ত্রীর স্বামীই স্বর্গ। স্বামীই ধর্ম্ম।

২। নিয়ত ধর্ম্মের অনুবর্ত্তিনী হইয়া আত্মার পবিত্রতা সাধন করিবে।

৩। মনে রাখিও স্ত্রী জাতি মায়ের জাতি, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বাসী মায়ের সন্তান। যদি কখনো সেই সন্তান গণকে উচ্ছৃঙ্খল বিপদ গ্রস্ত, অসহায়, রোগ ক্লিষ্ট দেখিতে পাও, তখন বিশ্ব জননীর ন্যায় স্বীয় অঞ্চলে অশ্রুবিন্দু মুছাইয়া পবিত্র হৃদয় রূপ স্বর্গ-ধামে আশ্রয় দিও। ইহাই আমার প্রাণ প্রিয়তম উপহার।

অবিনশ্বর জগতে তোমার করে আজ এই স্মৃতিটুকু আঁকিয়া দিতেছি; চিরদিন স্মরণে রাখিও, ইহাই আমার কামনা। কখনও তোমাকে আশীর্ব্বাদ করতে সাহস করিনি, আত্ম-নির্ভরতার ক্ষমতা তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। আজ সব ভয় ভেঙ্গে গেছে। আজ আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন মুক্ত। মনের সংযমই ত গৃহীর ধর্ম্ম। তাই বড় আনন্দে তোমায় জানাতে এসেছি, আমি আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষা করতে পেরেছি। এই মর্য্যাদার জোড়ে আজকের এই আশীর্ব্বাদ কর্ম্মক্ষেত্রে চিরদিন তোমায় অবিচলিত রাখবে। জীবনে আর কখনো তোমায় উত্যক্ত করিতে আসিব না। ভগিনী! এই—শেষ—বিদায় দাও; অবোধ বলিয়া মার্জ্জনা করিও।"